বাতায়ন

এক দশক

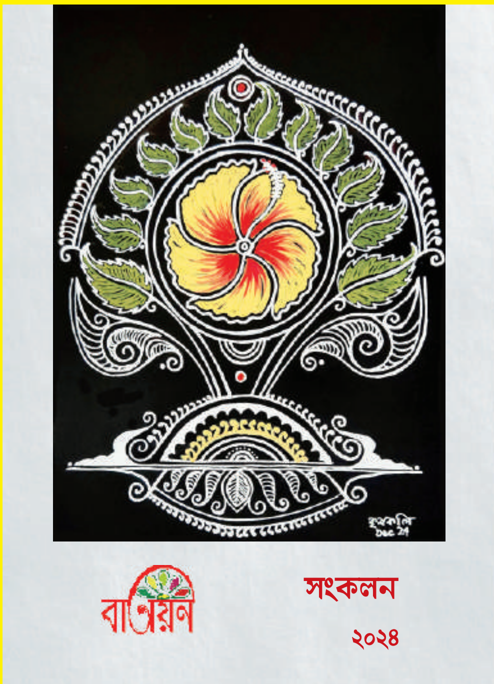
বাতায়ন
সংকলন
২০২৪

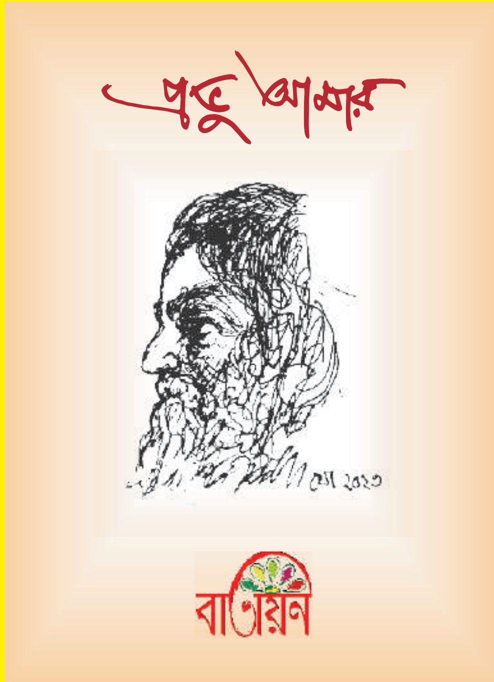
প্রভু আমার
বাতায়ন

বাতায়ন
সংকলন

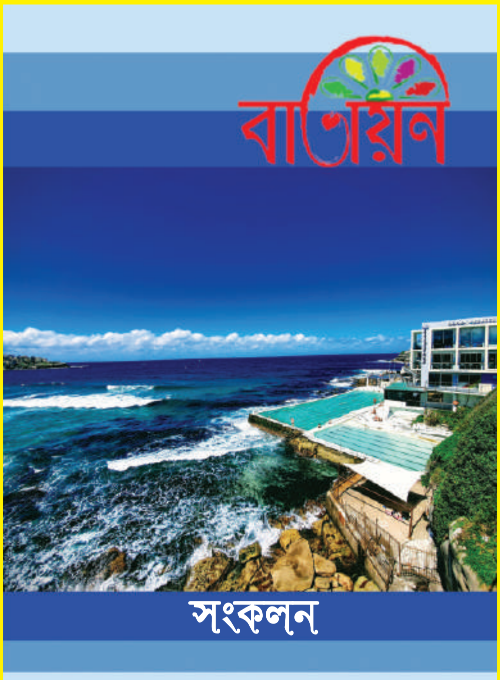
বাতায়ন
সংকলন

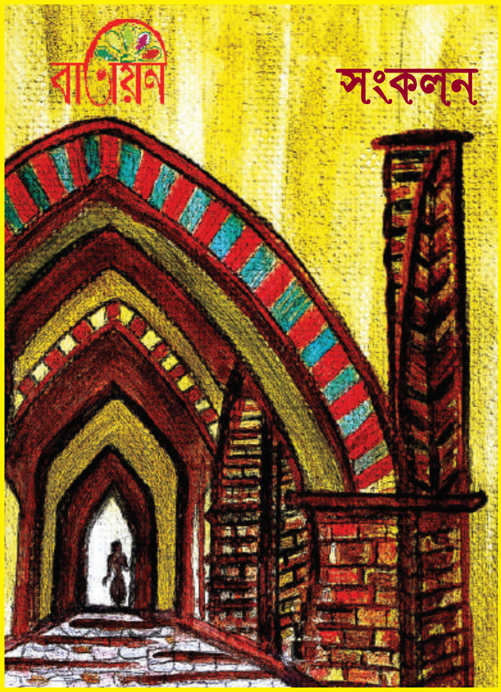
বাতায়ন
সংকলন

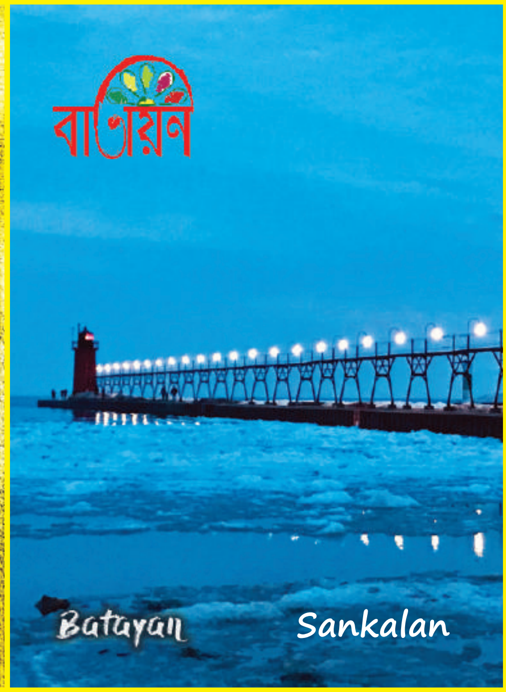
বাতায়ন
Batayan
Sankalan

বাতায়ন
সংকলন

বাতায়ন
Batayan
সংকলন

বাতায়ন
সংকলন

Batayan

Chief Editor: Ranjita Chattopadhyay

Issue No. 36 | January, 2026

A literary magazine with an International reach

Issue No. 36 | January, 2026

Chief Editor
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Sydney, Australia

Design & Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support
Susanta Nandi, India

Chairman & CEO
Anusri Banerjee
Perth, Western Australia
neospectrum58@gmail.com

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registration No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Photo Credit

Supratik Mukherjee — **Front & Back Cover**

সুপ্রতীক মুখার্জী। পার্থিব বাসিন্দা। প্রজ্ঞা-পিয়াসি।

Deb Bandyopadhyay — **Title Page**

দেব বন্দ্যোপাধ্যায় – পেশায় পদার্থবিদ্যার গবেষক, তবে যতটুকু সময়ের অবকাশ তা ভরে যায় কবিতা নিয়ে চিন্তা আর সাহিত্যের ছাত্র হবার বাসনা। দেবের লেখা কবিতা, অনুবাদ, গল্প ও প্রবন্ধ কিছু পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে। লেখা ছাড়া উত্তর আমেরিকার কয়েকটি বাংলা পত্রিকার সম্পাদনার কাজেও যুক্ত দেব । সপরিবারে মিশিগানের বাসিন্দা।

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

:: কবিতা ::

তসলিমা নাসরিন	**মৃত্যুহীন মেয়ে**	১২
ইন্দিরা চন্দ	**মৃত্যুযাপন**	১৩
শুভ্র দাস	**অসুখ**	১৪
	ছায়ার ছবি	১৪
তাপস কুমার রায়	**বিস্মরণ**	১৫
পঞ্চতপা দে সরকার	**আজ একটা তুমি দিন হোক**	১৬
অভীক রায়	**তারিখ**	১৭
সুগত খাসনবিশ	**এক যাযাবর**	১৮
তমঘ্ন গোস্বামী	**পেন্ডুলাম**	১৯
ব্রতী ভট্টাচার্য	**অলীক**	২০
রুদ্রশংকর	**কেমন আছো, মারুফা ...**	২১

:: গল্প ::

শমীতা দাশ দাশগুপ্ত	**পুতুলখেলা**	২২
সুমিতা বসু	**জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ**	২৮
রমা সিনহা বড়াল	**সৌরমন্ডলের কথা**	৩৩
দেবব্রত তরফদার	**ব্যতিক্রমী**	৩৭
কাজী লাবণ্য	**ধূসর জোছনা**	৪৪
পৌষালী ঘোষ	**হলুদ গোলাপ**	৪৯
মিতা বোস	**ফেলে আসা দিনের কথা**	৫২

:: অনুগল্প ::

হুমায়ূন কবির	**গন্তব্য**	৫৫

:: শ্রদ্ধা ও স্মরণ ::

রূপা মজুমদার	**নারায়ণ সান্যাল – একাই একটা ইন্ডাস্ট্রি**	৫৭
ফারুক ফয়সল	**রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো**	৬০
অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়	*(মেজদার হোটেল)* **কমলকুমার মজুমদার – এক ইউরোপীয় ব্রাহ্মণকে ফিরে দেখা**	৬৪

:: ভ্রমণ ::

স্বাগতা চট্টোপাধ্যায়	**গঙ্গোত্রীর যাত্রাপথে**	৬৮
অঞ্জন রায়	এ্যামাজনের জঙ্গলে ক'টা দিন	৮১

পত্রিকার এক দশক

"রঞ্জিতা, আমার খুব ইচ্ছে করে প্রবাসী বাঙালীদের লেখা একত্র করে একটা পত্রিকা প্রকাশ করি।"

"এ তো খুব আনন্দের কথা। করবে সত্যি?"

"নিশ্চয়ই করব। প্রবাসীরা বাংলার থেকে বহুদূরে থেকেও এতো যত্ন করে ভাষাটার চর্চা করেন, এতো ভাল সব লেখা লেখেন যে আমার ভারী ইচ্ছে করে মূলত বিদেশবাসীদের লেখা নিয়ে একটা পত্রিকা হোক।"

দূরভাষের একপ্রান্তে পার্থের অনুশ্রী ব্যানার্জী (আমাদের অনুশ্রীদি বা অনুদি) আর অন্য প্রান্তে শিকাগোর আমি। অনুশ্রীদি ইতিমধ্যেই আমেরিকার নানা জায়গায় সুপরিচিত নাম। বিভিন্ন মার্কিন দেশের বিভিন্ন শহরে শারদীয়া পত্রিকা প্রকাশের রূপায়ণ ও ছাপার কাজে জড়িত থাকার সুবাদে প্রবাসীদের লেখালেখি জগৎ তাঁর কাছে পরিচিত। ছোট্ট এই ফোন কথোপকথন ছিল বাতায়নের জন্মের গোড়ার কথা। সময়টা ছিল ২০১৪ র মাঝামাঝি। বাতায়নের প্রথম বৈদ্যুতিন সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২০১৫ র এপ্রিলে। তারপর দশটি বছর পার হয়ে গেছে। একটা পত্রিকার জীবনে দশ বছর হয়তো খুব বেশী সময় নয়। তবে আজকের ডিজিটাল যুগে, যেখানে content তৈরী করতে বা মুছে ফেলতে সময় লাগে সামান্যই, সেখানে শুধুমাত্র লেখালেখির প্রতি ভালবাসা থেকে উৎসারিত একটা উদ্যোগ দশ-দশটি বছর ধরে চালানো একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। বাতায়নের ছোট্ট বীজ আজ একটি সতেজ চারাগাছ। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নিজের প্রাণশক্তিতে।

বিগত দশ বছরে বাতায়নের কর্মকাণ্ডের বৃত্ত প্রসারিত হয়েছে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের জন্মলগ্নের যে স্বপ্ন আমাদের ছিল তা আজও একই রয়ে গেছে। বাতায়ন পত্রিকার মূল সুরটি হল সমন্বয় আর সংযোগের। দেশে ও প্রবাসে বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্য ভালবেসে যাঁরা লিখছেন গল্প, কবিতা, উপন্যাস বা প্রবন্ধ, তাঁদের সৃষ্টিশীলতা প্রকাশের একটা মঞ্চ হল বাতায়ন। একনিষ্ঠভাবে এই কাজ আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এক দশক ধরে। আমাদের প্রাপ্তি? সেও আছে বৈকি! বন্ধুদের অকৃত্রিম ভালবাসা।

'I have checked the Batayan site this evening. I am very glad to find my essay on Nimantron Bibhrat in the recent Rabindranath issue.

The layout of my essay looks nice!

I read the Editorial and glanced over some writeups. All look great. In my view, all were written very professionally.'

"সারা দিনই প্রায় পড়ছি। এতো সবই বেশ ওজন ভারী লেখা। খুব ভালো লাগছে।" বন্ধুরা যখন তাঁদের ভাললাগার কথা জানান তখন খুব আনন্দ হয়। মনে হয় আমাদের শ্রম ও সময় ব্যয় সার্থক।

পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি প্রবাসে বাঙালী সাহিত্যিকদের কাজ পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস ছোট করে হলেও চালিয়ে যাচ্ছে বাতায়ন। বইমেলাতে বাতায়নের স্টলে প্রবাসী ও পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যচর্চাকারীদের মেলামেশা ও আড্ডার একটা পরিসর তৈরী হয়। বিগত দশ বছরে একাধিকবার Center For Stories, PEN Perth ও বাতায়নের এর যৌথ

উদ্যোগে কবি শ্রীজাত, তন্ময় চক্রবর্তী তাঁদের কবিতা ও কবিতাভাবনা তুলে ধরেছেন বিদেশী পাঠকদের কাছে। West Australian Poets ও বাতায়ন যৌথভাবে নিবেদন করেছে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের নাম হল Bard Of Bengal. এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের অনূদিত লেখার পাঠ ও গান পৌঁছে গেছে অ-বাংলাভাষী শ্রোতা ও পাঠকদের কাছে। এরই পাশাপাশি বাতায়নের উদ্যোগে সংগঠিত হয়েছে বেশ কয়েকটি কবিতা কর্মশালা। নিঃসন্দেহে এসবই প্রবাসে বাংলাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ।

এসব ভাবলে আনন্দে আর গর্বে মন সত্যি ভরে যায়। সেই গর্ব বাংলা ভাষা আর তার চর্চাকারীদের নিয়ে। গর্ব হয় বিশ্বের নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সাহিত্যপ্রেমীদের নিয়ে। পেশাদার লেখক না হলেও মূলত তাঁদেরই রচনায় সমৃদ্ধ বাতায়ন। Diasporic বাংলা চর্চার জগতে বাতায়ন যে একটা উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নিয়েছে এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই আর। এবারের বৈদ্যুতিন সংখ্যাটি গত এক দশকের পথ চলা মাথায় রেখে সাজানো। বেশ কিছু নতুন লেখা তো আছেই, সেইসঙ্গে আর্কাইভ ঘাঁটতে বেরিয়ে পড়ল যেসব মণিমুক্তো, পাঠকদের জন্যে সেগুলিও এখানে সাজিয়ে দেওয়া হল।

বাতায়ন সাহিত্য পত্রিকা – গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনীর সম্ভারে সাজানো পত্রিকার সব সংখ্যা। কোন কোন বিশেষ সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছে বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। তাঁদের মধ্যে সাহিত্যিকদের সংখ্যাই যে বেশী একথা বলাই বাহুল্য। প্রবাসী পাঠকেরা বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছেন নিজেদের বুকের মধ্যে। কবিগুরু আছেন সবার ওপরে। প্রতি বছর প্রকাশিত হয় মূলত প্রবাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক রচনা সংকলিত একটি বিশেষ সংখ্যা – "বাতায়ন বৈশাখী"। তাছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে শঙ্খ ঘোষ, শীর্ষেন্দু, শংকর, আশাপূর্ণা প্রমুখদের নিয়ে বিশেষ সংখ্যা। বাংলাভাষার উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এইসব বিশেষ সংখ্যাগুলি ক্ষুদ্র হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। পাঠকদের এই স্মৃতিচারণগুলির মধ্যে শুধু যে ধরা থাকছে তাঁদের নিজেদের চর্চা তা কিন্তু নয়। আগামীদিনে পত্রিকার কোন পাঠক হয়তো কোন লেখা পড়ে উৎসাহী হবেন সেই লেখকের সৃষ্টি সম্বন্ধে জানতে। আর এভাবেই পুষ্ট হবে আমাদের ভাষার গাছ। এইসব প্রবন্ধগুলি কোনোমতেই সত্যজিৎ রায়, রামকিঙ্কর বা শঙ্খ ঘোষের মূল্যায়ন নয়। এগুলি হল পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের অনুরাগ মেশানো স্মৃতিতর্পণ। পূর্ব প্রকাশিত এইধরনের কিছু রচনাও সংকলিত হল পত্রিকার দশকপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এই সংখ্যাতে।

সম্প্রতি শিকাগো শহরে এসেছিলেন সাহিত্যিক সালমান রুশদি। সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা কি?" উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন সেটা কিছুটা এইরকম। সাহিত্য আমাদের অন্যরকমভাবে চিন্তা করতে শেখায়। সাহিত্য সমাজে বদল আনতে পারে না। কিন্তু তা আমাদের নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। আর তাই থেকেই আসে পরিবর্তন। পৃথিবীজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক এক ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে তাই মনে হয় বাতায়নের মতো উদ্যোগ সত্যি ভারী গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জীবনে। বাতায়নের বন্ধুদের কাছে অনুরোধ রইল তাঁদের নিজেদের বাতায়নের সঙ্গে পথ হাঁটার অভিজ্ঞতা লিখে জানানোর জন্যে। আপনাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রীতি ছাড়া আমরা এক দশক ধরে পথ চলতে পারতাম না। তাই আপনাদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আশা করি ভবিষ্যতেও আপনারা ভালবেসে থাকবেন 'বাতায়ন' এর পাশে।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
চিফ এডিটর – বাতায়ন পত্রিকা
২৫শে নভেম্বর, ২০২৫

সংকলন ২০২১-শে প্রকাশিত

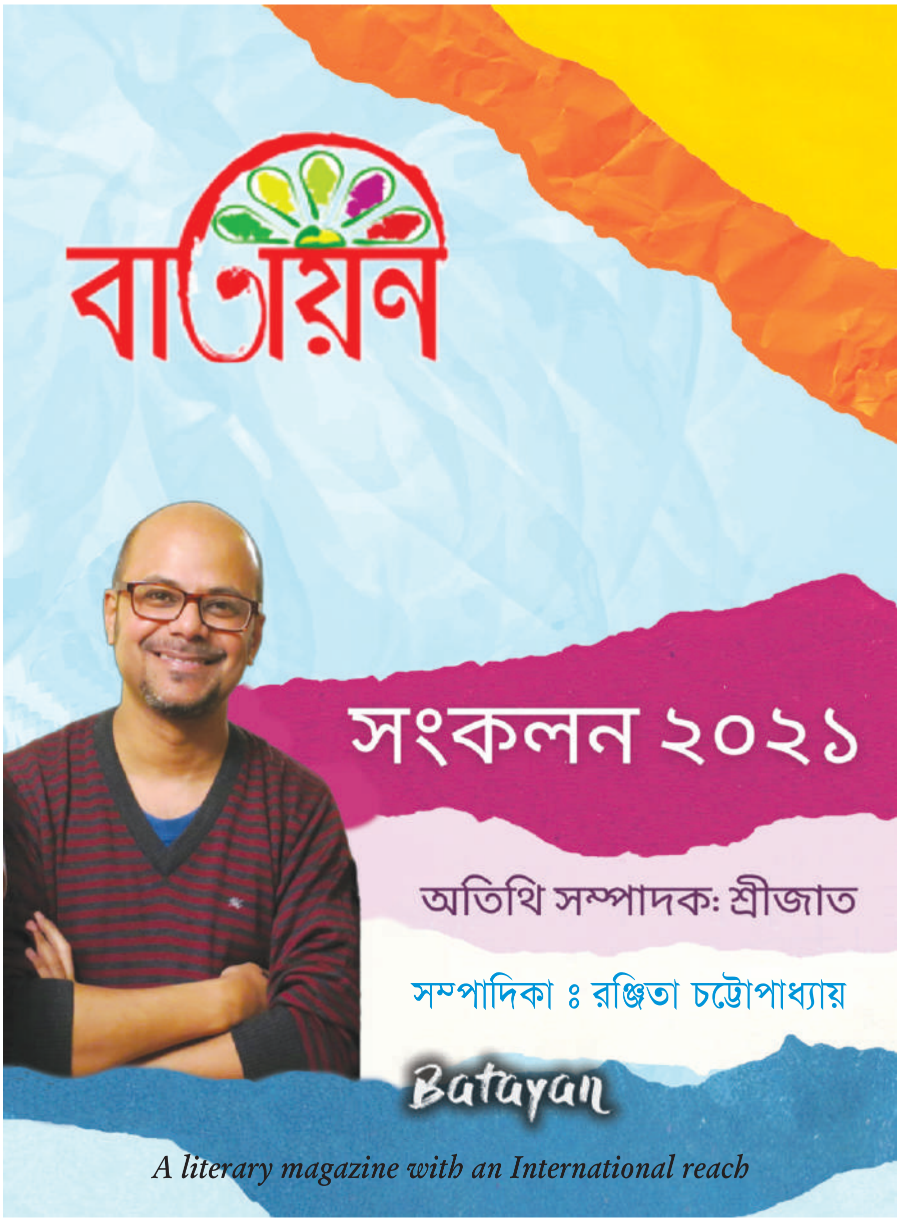

মানবসভ্যতার ইতিহাসে যে-সময়ের কথা কালো হরফে লেখা থাকবে, আমরা এখন সশরীরে সেই অন্ধকার সময়টা পার হচ্ছি। অতিমারী। যখন শুরু হয়েছিল এই সময়টা, তখন আমরা নিশ্চিত কেউই ভাবিনি, এর স্থায়িত্ব বা প্রভাব এত দীর্ঘ, এত মর্মান্তিক হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের সাক্ষী রেখে এই অতিমারী আমাদেরই গড়ে তোলা সমস্ত কিছুকে একে একে তছনছ করে দিল। এ যেন এমন এক দীর্ঘ সুড়ঙ্গ, যার ওপারে আমাদের পুরনো পৃথিবীটা আর আমাদের অপেক্ষায় থাকবে না। বরং আমাদের মানিয়ে নিতে হবে নতুন এক সময়, বদলে যাওয়া এক গ্রহের সঙ্গে। আর এই মানিয়ে নেবার পদ্ধতি যখন শুরু হয়েছিল, তখন সবচাইতে বেশি আঘাত নেমে এসেছিল শিল্পেরই উপরে। শিল্পের সঙ্গে জুড়ে থাকা একজন দিনমজুর হিসেবে গোড়ায় খানিক অভিমান যে হয়নি, তা নয়। পরে অবশ্য মনে হলো, যেখানে গোটা একটা সময়, একটা সভ্যতা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, যেখানে আগামীকালের কোনও স্থিরতা নেই, নেই প্রাণের কোনও সুরক্ষা অথবা উপার্জনের প্রতিশ্রুতি, সেখানে মানুষ কীভাবেই বা শিল্পের কাছে যাবে, তার পাশে বসবে দু'দণ্ড স্থির হয়ে ?

কিন্তু শিল্পই হয়তো পারে, এই অসম যুদ্ধের মুখেও ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের কথা বলতে। তবে সে একা তো পারে না, তার প্রয়োজন হয় মানুষেরই হাত, মানুষেরই মুখ, নিজের কথা বলবার খাতিরে। আর তেমন মুখ, তেমন হাতের সমাহার আমাদের এই "বাতায়ন"-ও। বাতায়ন যে কেবলই এক সাহিত্য পত্রিকা নয়, কেবলই লেখা প্রকাশের পাতাবাহার নয় যে সে, এ-কথা অন্তত গত দু'বছরে প্রমাণিত। এমনিতেই, নিজের ভাষার থেকে, নিজের মাটির থেকে বহু দূরে বসবাস করে নিজের ভাষা-সংস্কৃতিকে জিইয়ে রাখা কোনও লড়াইয়ের চেয়ে কম কিছু নয়। সে-লড়াইয়ে বাতায়ন গোড়া থেকেই জয়ী যে, আমরা সকলে তা জানি। বাতায়নের কারিগরেরা যে-উদ্যম, যে-আনন্দ, আর সর্বোপরি যে-স্বপ্ন সম্বল করে শুরু করেছিলেন, তাতে এই ভৌগোলিক দূরত্ব হার মানতে বাধ্যই হয়েছে।

তা সত্ত্বেও, দুশ্চিন্তা হচ্ছিল আমার, একজন পাঠক হিসেবে, অতিমারীর এই আক্রমণের মুখেও কি বাতায়নের জেদ টিকে থাকবে ? যেখানে সারা পৃথিবীর শিল্প এসে দাঁড়িয়েছে অস্তিত্বের সংকটের সামনে, সেখানে বাংলা ভাষার এক প্রবাসী পত্রিকা কি পারবে, এই দুঃসময়েও নিজের নিশান আকাশে উড়িয়ে রাখতে ? কিন্তু আমার মতো পাঠকের এমন প্রশ্নের মুখে ছাই দিয়ে বাতায়ন মাথা উঁচু করে আছে, এই অন্ধকার সময়ের মধ্যেও। কেবল তা-ই নয়, সে নিজের ভাবনায়, শৈলীতে, সৌন্দর্যে, উৎকর্ষে বৃদ্ধি পেয়েছে বৈ কমেনি এতটুকু। এ-কৃতিত্বের মূলে যেমন আছেন বাতায়নের স্বপ্নদর্শীরা প্রত্যেকে, তেমনই এই পারদর্শিতার রহস্য লুকিয়ে আছে আরও গভীরে। আর তা হলো, নিজের মাটির প্রতি, নিজের ভাষার প্রতি, নিজের শিকড়ের প্রতি অগাধ টান আর ভালবাসা। আমার মনে পড়ে যায়, ডুবন্ত টাইটানিকের ডেক-এ বাজনারত সেইসব শিল্পীদের কথা, যাঁরা আরও কয়েক মুহূর্ত বাজিয়ে নিতে চাইছিলেন, সবটুকু তলিয়ে যাবার আগে। কতখানি ভালবাসা থাকলে এমনটা সম্ভব ? সেই ভালবাসাই আজ বাতায়নের মুকুটের সেরা পালক।

মানবসভ্যতার জাহাজ হয়তো শেষমেশ ডুববে না, কিন্তু যে-ঝঞ্ঝা, যে-বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হচ্ছে, সেও ডুবে যাবার চেয়ে কম বিপদের নয়। তবু, তার মধ্যেই, বাতায়ন খোলা রেখেছে তার টানটান আর উদার দুই পাল্লা, যাতে শিল্পের বাতাস এসে বারেবারে ঘর ধুইয়ে যেতে পারে, যাতে সংস্কৃতির রোদ এসে প্রতিদিন আলো করে দিয়ে যেতে পারে চারপাশ। এই জয়গাথাও ইতিহাসে স্থান পাবার দাবি রাখে।

আমার গৌরব এই যে, বাতায়নের সকলে আমাকেও তাঁদের পরিবারের অংশ করে নিয়েছেন, মুড়ে রেখেছেন এক অলীক ভালবাসায়, যার ঋণ শোধ হবার নয়। এর আগেও বাতায়নের সম্পাদকীয় কাজে যুক্ত থাকবার সুবাদে দেখেছি, কী পরম যত্নে প্রতিটি লেখা এখানে তুলে ধরা হয়। এবারেও তার নড়চড় হয়নি। গদ্য হোক, কবিতা হোক, অন্যান্য লেখা হোক, তার মান বা আত্মবিশ্বাস, কিছুতে এক ফোঁটা ঘাটতি ঘটেনি। আর এখানেই বাতায়নের জয়। এ-কথা তো আমরা জানি যে, গত দু'বছরে ওলোটপালট হয়ে যেতে থাকা একটা গ্রহে কেবল টিকে থাকার জন্যই আমাদের কত রকমের টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। সেই লড়াইয়ের ছাপ কিন্তু বাতায়নের পাল্লার রং বদলে দিতে পারেনি। সেই কষ্টের দাগ কিন্তু লেখার কলমের গোড়ায় এসে বসত তৈরি করতে পারেনি। কারণ একটাই। বাতায়ন কেবলমাত্র একটি পত্রিকা বা প্রকাশনা নয়। বাতায়ন সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মানুষের আবেগের ঠিকানা, যার কোনও বদল নেই কোথাও। বাতায়নের এই নতুন সংখ্যার কাজেও একটু যে জুড়ে থাকতে পারলাম, একজন সামান্য পাঠক আর শব্দকর্মী হিসেবে এ আমার কম গৌরব নয়। এই ঠিকানায় আরও অনেক অনেক নতুন জানলা খুলে যাক, বাতায়ন দিনে দিনে সার্থকতর হোক, এটুকুই চাওয়া। আর কিছু নয়।

শ্রীজাত

সংকলন ২০১৮-তে প্রকাশিত

লেখো আয়ু, লেখো আয়ু

যশোধরা রায়চৌধুরী

মনে পড়ে ১৯৮৫ সাল। প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের শেষাশেষি অথবা সেকেন্ড ইয়ারের শুরু সেটা। কলেজটাই নরম লোহার পাতকে দুমড়ে মুচড়ে আকার আকৃতি দেয়। কলেজের তিন প্লাস দুই ওই পাঁচটা বছর। আমার কাছে অমোঘ, অনিবার্য। বি এ ফার্স্ট ইয়ার থেকে এম এ পড়া অব্দি জীবনের বছরগুলোর যে দৃপ্ততা, তা আমার বাকি জীবনকে গড়ে দিল। দেয় বোধ হয় এভাবেই। আর সেই সময়ের প্রতি মুহূর্ত কীভাবে যেন গানে কবিতায় বইয়ের পাতা ও সিনেমায় এক জমজমাট হয়ে চলা, বেজে ওঠা অর্কেষ্ট্রা ছিল।

সেই অর্কেস্ট্রায় প্রায় প্রতিদিন ছিলেন শঙ্খ ঘোষ ও তাঁর কবিতারা।

আমি কে হই — শঙ্খ ঘোষের কবিতা নিয়ে, তাঁর কবিতার ইতিহাসচেতনা নিয়ে কথা বলার ? আমার কোন অধিকার, যোগ্যতা এই বিশাল প্রেক্ষিত নিয়ে বিচার করবার ? আমি বলি আমার কথা। তুচ্ছ কথা, কিন্তু মিছে কথা নয়। বরং তা থেকেই গড়ে নেওয়া যায় এক অন্য ইতিহাস।

আমাদের কলেজ জীবনের সেই দিনগুলোর ধরতাই ছিল রাজনীতি। এক দিকে এস এফ আই, অন্যদিকে অতিবাম রাজনীতির ছেলেপিলেরা ক্যান্টিন কাঁপাত, পোর্টিকোয় জমায়েত হত। ক্লাসে ক্লাসে ক্যামপেন করত। তো, সেইসব ক্যাম্পের থেকেই আসত ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা, ভোট পেয়ে যারা ইউনিয়ন রুম দখল করত আর তারপর একের পর এক আয়োজন করত নানান প্রতিযোগিতার।

আশ্চর্যের কথা, সেরকমই এক ইউনিয়ন আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম বিষয় হিসেবে পেয়েছিলাম, 'বাবুমশাই'।

সে ছিল একদিন আমাদের যৌবনে কলকাতা !
বেঁচে ছিলাম ব'লেই সবার কিনেছিলাম মাথা

আর তাছাড়া ভাই

আর তাছাড়া ভাই আমরা সবাই জেনেছিলাম হবে
নতুন সমাজ, চোখের সামনে বিপ্লবে বিপ্লবে

যাবে খোল-নলিচা

যাবে খোল-নলিচা পালটে, বিচার করবে নিচু জনে'
কিন্তু সেদিন খুব কাছে নয় জানেন সেটা মনে

মিত্র বাবুমশয়

প্রত্যেকের মুখে মুখে ফেরা সেই কবিতার সঙ্গে ক্যান্টিনের টেবিল পিটুনির শব্দ। ছন্দের মায়াজালের সঙ্গে সঙ্গে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ইতিহাসচেতনাই। কেননা তখন সময় লালে লাল। আমরা কম্যুনিস্ট কাকে বলে জানছি। কম্যুনিস্ট আদর্শবাদের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের সংঘাত নিয়ে এ কবিতা তার আগে অথবা পরে অনেকেই আবৃত্তি করেছে। কিন্তু মুখে মুখে ফেরা সেই মজাদার ছড়ার ছন্দের সূত্র একবার যার মাথার ভেতরে বসে গেছে, তার জীবন হয়ত পুরোটাই একরকম থাকেনি।

এই যে কলেজ ক্যান্টিনে বসে বসে জীবনের কিছু পাঠ নেওয়া, এই যে প্রতিটি রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ, আর এই যে কবিতার মধ্যে দিয়ে তা ঘটা — কেমন এক অব্যর্থ দীক্ষা এটা । শঙ্খ ঘোষের ভাষাতেই বলতে ইচ্ছে করে :

'আর কলকাতা খুলে দিল সাম্প্রতিকের দরজা । একদিনে নয়, দিনে দিনে । সেখানেও ছিল বহিরাগতের ভীরুতা, জানা ছিল না কোনদিকে আছে পথ . . . . প্রেসিডেন্সি কলেজের পিছনবেঞ্চ থেকে সামনের দিকে টান দিয়েছিল যারা, তারা কবি ছিল না কেউ, ছিল কবিতার প্রেমিক । তাদেরই হাতে উপহার পেয়ে পেয়ে একদিন আধুনিক কবিদের পৃথিবীতে পৌঁছে গেছি কখন । ছমছমে এক অজানা গুহার সামনে সেই আমাদের সমবেত মুগ্ধতা — আজও স্পষ্ট মনে পড়ে ।' (কবিতার মুহূর্ত)

আশ্চর্য, এই কথা কি আমারো নয় ? অথবা, আমরা কি নিজেদেরই বার বার করে তৈরি করে নিইনা আমাদের পিতৃসমদের আদলে ? হয়ত এভাবেই ঘটে দীক্ষা, চলে প্রজন্মের পর প্রজন্মে চলাচল, মানসধারার ।

হ্যাঁ, সেই বইটিকে আবিষ্কারও আমার ক্যান্টিনে বসেই । একদিন এক বন্ধু ক্যান্টিনে নিয়ে এল পাতলা একটা বই । 'কবিতার মুহূর্ত' । এ বই নিয়ে কীভাবেই না কাড়াকাড়ি করেছি । এই বইতেই পেয়েছি, কবির নিজের লেখা নিজের কবিতার ইতিহাস — যে প্রবন্ধটির নামই 'কবিতার মুহূর্ত' ।

নিভন্ত এই চুল্লীতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে ।

...

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে ।
যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে ।

নিভন্ত এই চুল্লীতে বোন আগুন ফলেছে !

'যমুনাবতী'-র মত অতি জনপ্রিয় কবিতার লেখার পেছনের ঘটনাকাহিনি, কোন সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংযোগ করে চিন্তার বারুদে আগুন, আর ঘটিয়ে তোলে কবিতার আতশবাজি . . . তা জানার সুযোগ পেয়েছি । জেনেছি 'বাবরের প্রার্থনা'-র মত কবিতার প্রেক্ষাপট । আরো কত, কত কবিতা । 'আরুণি উদ্দালক', 'আপাতত শান্তিকল্যাণ', 'লজ্জা', 'ভিখিরি ছেলের অভিমান', 'কলকাতা' । প্রতিটা কবিতা নিজেকে উন্মোচিত করেছে আমার কাছে, এই কবিতার মুহূর্তের হাত ধরে ধরেই । আর কী বিশাল এক ইতিহাসপট রচিত হয়েছে মাথার ভেতরে । কতটাই না বড় হয়ে খুলে গেছে কবিতার আকাশ ।

হ্যাঁ, ইতিহাসচেতনার প্রথম পাঠ তো এভাবেই পেতে হয় । সমাজসচেতন, এক তীব্র সময়-সংবেদী কবির প্রতিটি অক্ষরকে হতে হয় সৎ ও দায়বদ্ধ, প্রতিটি অক্ষর থেকে ঝরে পড়ে তাঁর বিশ্বাসের কথা — এই কথাটিও মনের ভেতর মুদ্রিত হয়েছে সেই সময় থেকেই অমোঘভাবে । আর তো কোনমতেই তা থেকে মুক্তি এল না আমার মত সামান্য কবিতালেখকেরও ।

নিজেকে যখনই মনে হয়েছে বিচ্ছিন্ন, প্রেসিডেন্সির ক্যান্টিন থেকে শুরু করে, জীবনের যে যে ক্ষেত্রে নিজের 'অযোগ্যতা' নিজেই দেখে মুখ লুকিয়ে সরে আসা হয়, তখন তো সাথী হয় 'কলকাতা'-র মত অমোঘ কবিতাই। 'বাপজান হে/কইলকাত্তায় গিয়া দেখি সক্কলেই সব জানে/ আমিই কিছু জানিনা' . . . .

২

তার কিছুদিন পরে এল 'জার্নাল'। হাত থেকে হাতে তারপর নদীর মত প্রবাহিত হয়ে যায় বই। কাড়াকাড়ি করা হয়, পড়া হয়, গদ্য দিয়ে যে কবিতা লেখা যায় জানতে পারি ধীরে ধীরে। এরপর আমরা বড় হয়ে গেলাম। আমরা আমাদের যার যার জীবনে অংশগ্রহণ করলাম। আমি তো আর ফিরে যাইনি পঠনপাঠনের প্রাঙ্গনে, করিনি মেধা ও জ্ঞানের বিশ্ববিদ্যায়তনিক চর্চা। অ্যাকাডেমিশিয়ার থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি আমি। এসেছি অন্য পেশায়।

কিন্তু কবিতা লিখতে লিখতে, কখনো যদি বা সমাজ সচেতন হবার চেষ্টা করে থাকি, তাহলে কি অদৃশ্য এক হাত মাথার উপর অনুভব করিনি সর্বদাই, তাঁরই ? তাঁরই দেখান পথে কি যাইনি, শ্লেষের পথ ধরে, নয়া-অর্থনীতির পরবর্তী নব্বই দশকের দিনকালে, সমসময়ের অলিগলি চোরাপথগুলি ঘুরতে, সেগুলি নিয়ে লিখতে ! এতটাই যে, এমনকি দেশ পত্রিকার দপ্তরে লেখা জমা পড়ার পর, শ্রদ্ধেয় সম্পাদক বলেছিলেন নাকি (অপর এক কবির মুখেই যা আমার বিশ্রুত), এই মেয়েটি শঙ্খ ঘোষকে অনুসরণ করে দেখছি।

এ আমার সম্মান। সেই নব্বই দশকের পর আরো এক দশক কেটে গেছে। 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি' বা 'এক দশকে সংঘ ভেঙে যায়'-এর মত কথা সবই শঙ্খ ঘোষের লিখিত কবিতার লাইন, কিন্তু আমাদের প্রজন্মের এক-একটি স্লোগানের মত। 'রাতে ঘুমোবার আগে ভালোবাসবার আগে প্রশ্ন করো কোন্ দল তুমি কোন্ দল', 'শবের উপর শামিয়ানা' — এক একটি মেধাবী খড়গ, না বোঝার, কুয়াশার আঁধার কেটে ফেলার। মুখে মুখে উচ্চারিত হবার মত সহজ, গভীর, তীব্র, আলো।

তারপর, ভাঙনময় এক দুরূহ সময়ে দাঁড়িয়ে, দু হাজার ছয় থেকে সাত, নতুন এক আলোক উদ্ভাসে চিনেছি সময়চেতনার দিশারী শঙ্খ ঘোষকে। আমার আশৈশবের শোনা আন্দোলন তো একটাই ছিল তার আগে অব্দি। গল্পগাথার, সত্তর দশকের, নকশাল আন্দোলন। সে আন্দোলনের রোমান্স, সে আন্দোলনের বিশ্বাসের ধারে মর্চে পড়ে গেছিল, বহুদিন। তিরিশ বছর পশ্চিমবঙ্গ 'শান্তিকল্যাণ'-এ ছিল। এক মজে যাওয়া, পলিতকেশ বিশ্বাসের, অথবা বিশ্বাসহীন আদর্শ-কপচানোর সময়ের শবের উপর শাসকের শামিয়ানা ছিল হয়ত বা। একটি স্বপ্নদেখানো রঙিন তাজ পরা বিরাট পার্টিতন্ত্র, তাঁদের অভিপ্রায় ভুলেছিলেন, তাঁদের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেন নি। মানুষের থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন, মানুষের রক্ত ঝরেছিল সে সরকারের পুলিশের হাতেই। উন্নয়ন আর শিল্পের সম্ভাবনার বেদীতে কৃষকের বলিদান হতে গিয়েছিল, আর সেই নাটকীয় দৃশ্যগুলো সদ্যজাগরূক দৃশ্য-শ্রাব্য মিডিয়ার উপর ঝরে পড়েছিল প্রবল আঘাতে। আমাদের চোখ ঝলসে গিয়েছিল।

তারপর আবার রক্ত, রণ, আবার প্রবল তোলপাড়, মানুষের ইচ্ছে, চেষ্টা, শক্তি। মানুষের কথা আবার ভাবার যুগসন্ধি। এই সময়টাই তাই — এক অনিবার্য দ্রুততায়, খুলে গেল আমাদের মনের কপাট। একের পর এক সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মুখে মুখে, প্রতি মুহূর্তে প্রশ্নের পাথরে বিদ্ধ হতে লাগলাম আমরা এবং আমাদের প্রায় স্থির বদ্ধ জলার ভেতরে উঠতে শুরু করল তরঙ্গ।

সেই সমসময়ে ইতিহাস আবার রচনা করলেন শঙ্খ ঘোষ। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিবেকী চেতন ও তীক্ষ্ণ ধারের শ্লেষ নেমে আসতে লাগল একের পর এক কবিতায়।

বিনয় কোঙার যখন বাক্যবাণে ঘৃণা ঝরিয়ে দিচ্ছেন, কেউ তাঁর মতাদর্শের বিরুদ্ধতা করলেই তার জীবন 'নরক করে' দেবার আশ্বাস দিচ্ছেন, সেই সময়েই শঙ্খ ঘোষের এই লেখাটি সংবাদপত্রের পাতা থেকে আমাদের যৌথ স্মৃতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মজা এই যে, বিনয় চলে গেলেও, যে কোন নেতার অবিনয়ের সঙ্গে এ লেখার শ্লেষাক্ত বাচন কেমন করে জানি মিলে যায়।

আমি তো আমার শপথ রেখেছি
অক্ষরে অক্ষরে
যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন
দিয়েছি নরক করে।
দাপিয়ে বেড়াবে আমাদের দল
অন্যে কবে না কথা
বজ্র কঠিন রাজ্যশাসনে
সেটাই স্বাভাবিকতা।
গুলির জন্য সমস্ত রাত
সমস্ত দিন খোলা
বজ্র কঠিন রাজ্যে এটাই
শান্তি ও শৃঙ্খলা।
যে মরে মরুক, অথবা জীবন
কেটে যাক শোক করে —
আমি আজ জয়ী, সবার জীবন
দিয়েছি নরক করে।

(স-বিনয় নিবেদন)

৩

আমাদের এই সময়টাকে সর্বদিক দিয়ে সর্বার্থে জড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁরই কথায়, 'শিকড় দিয়ে আঁকড়ে' আছেন। বাংলা কবিতায় প্রায় ষাট বছর ধরে তিনি তৈরি করে নিয়েছেন এমন এক পথ, যে-পথে স্বল্প যাত্রী, যে পথে সামান্য আলো জ্বলে। সমালোচনায় নিয়ে এসেছেন সর্বজনবোধ্য এক জ্ঞানচর্চার দিশা, সংক্রামকভাবে বার বার সাড়া দিয়েছেন সংকট সময়ে।

— শঙ্খ ঘোষ বিষয়ে রেজাউল করিম সুমন

কবির 'নিঃশব্দের তর্জনী'কে অনেকে বলেন, 'নিহিত পাতালছায়া' — ভূমিকা। নিজের ভেতরে সমসময়কে বিস্তার দেওয়া। এ বড় কঠিন দায়। অথচ কবি যেহেতু ক্রমাগতই এ কাজটি করে চলেন, কবিতায় ও গদ্যে, তাই এ কথা মনে হতেই পারে। 'কবি ও তার পাঠক' বলে এ গ্রন্থে একটি প্রবন্ধ আছে। যে লেখায় কবির নিজস্ব বীক্ষণকে আমরা পাচ্ছি। সেখানেই কবি 'সমসময়' নামে একটি অংশে লেখেন :

. . . কাকে বলি সমসময়। আমরা সকলে যে ঠিক একটাই সময়ে বেঁচে আছি, আমাদের সকলের সময় যে একেবারে সমান, এ কথা তত সত্যি নয়। . . . সময়ের যেন ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি তল তৈরি হয়ে আছে আমাদের ভিন্ন জনের অভিজ্ঞতায় . . .

শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন সকলেই কি আসলে আলাদা আলাদা সময়ে বাঁচি না আমরা ? আলাদা আলাদা বৃত্তে ?

তারপরেই তিনি বলেন, সমসময়কে তাই ধারণ করা যায়না, করা যায় ঐতিহ্যকে। ঐতিহ্য মানে কিন্তু অতীতমাত্র না, সে স্থাণু নয়। সে বার বার আবিষ্কৃত হয়।

সেখানে কবি নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলে দেন, শিল্পীর/কবির কাজ হল — দেশনিহিত কালকে দেশোত্তর কালে পৌঁছে দেওয়া। নদীকে সমুদ্রে মিলিয়ে দেওয়া।

বারবার এইসব প্রশ্নে ফিরে ফিরে এসেছেন তাঁর সারাজীবনের কথায়, লেখায়। আমি শুধু আলো পেয়েছি, দিশা পেয়েছি, ঘোর তমসায় যেমন দিশা দেখায় কম্পাস।

সমসময়কে দূরবীক্ষণ নিয়ে দেখার ক্ষমতাটি দিয়ে তিনি আমাদের কম্পাস হয়ে থাকেন। যে সময়ের বাসিন্দা আমরা, যে দেশের বাসিন্দা, সে দেশ ও কালে বেঁচে থাকতে থাকতেই সমসময় পাতিত আকারে পৌঁছে যাচ্ছে তাঁর কবিতার ভেতর দিয়ে পরবর্তী পাঠকের হাতে।

অথবা সমসময়ের পাঠকই, যেন, কবির নিজস্ব আতশ কাঁচের সহায়তায় দেখতে পাচ্ছেন তাঁর নিজের সময়কে, বিশাল প্রেক্ষাপটে চিরদিনের পৃথিবীর চিরদিনের হিংসা দ্বেষ গ্লানি মারমুখী আক্রমণ প্রেম স্নেহ সবকিছুর সঙ্গে মিলিয়ে। চিনতে পারছেন। লিখছেন তাই আয়ুকে। নিজের ও আমাদের আয়ুকে।

এখানে প্রাসঙ্গিক হবে বলেই তুলে দিচ্ছি কবির এক সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়।

প্র : 'নিঃশব্দের তর্জনী' তে লিখেছিলেন, 'এখন ইচ্ছে করে যেমন-তেমন বলতে, খুব আপনভাবে কাঁচা রকমে, খুব ছোটো আর খুব সহজ' ! — এখানে 'সহজ' বলতে কী বুঝিয়েছিলেন ? 'জলের মতো সহজ হব' বলেছেন কবিতায়। সেই 'সহজ'ই বা কী ? কবিতার সহজ কি ঠিক ততটা সহজ ?

উ : নয় তো। লিখেও তো ছিলাম 'সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়'। তখন যেটা বলতে চেয়েছিলাম তা হল নানা রকমের চমৎকৃতি থেকে বেরিয়ে আসার কথা। শব্দের ভার, ছবির জৌলুস, ছন্দের দোল — এসব থেকে নিজেকে যথাসম্ভব সরিয়ে নেওয়ার কথা। অন্ধকারে পাশাপাশি চুপচাপ বসে থাকতে পারে দু'জন, মাঝে মাঝে আলতো দু'-একটা কথা বলে ফেলে, সেইরকম। দৈনন্দিন কথাবার্তার চাল, তার শ্বাসপ্রশ্বাস, যথাসম্ভব তার কাছাকাছি থেকে কথা বলা। এসবকেই বলেছিলাম সহজ। কিন্তু তার থেকে যে — অনুভূতিটা পৌঁছয় তাতে হয়তো অনেক জট-জটিলতা থাকতে পারে। আসলে, ভাষার বা কথার নানা রকমের তল তৈরি হতে থাকে তখন। এক দিকে সহজ সীমায় সময়টাকে ধরে রাখতে পারে যে-ভাষা, সে কিন্তু অন্য দিকে আবার গড়িয়ে যেতে পারে অনেক দূরে।

প্র : সময়চিহ্ন ধরবার জন্য এখন অনেকেই সচেতনভাবে নিয়ে আসছেন প্রচুর হিন্দি বুলি আর ইংরেজি গালিগালাজ, টেলি সিরিয়াল, টেলিশো, এফএম রেডিও — এইসব থেকে খুঁজে পাওয়া। ওই ভাষাগুলোর সত্যিকারের স্পন্দ আর চালচলন বড়-একটা জানা থাকে না আমাদের। কেমন করে সচেতন থাকবেন লেখক, শব্দ দিয়ে বা কানে শোনা এইসব বুলি দিয়ে সময়কে ধরবার চেষ্টায় ?

উ : খুব বেশি চেষ্টা করে এটা হয় বলে মনে করি না। এ খানিকটা প্রবণতার ব্যাপার। বিশেষ বিশেষ কবির ক্ষমতার ব্যাপার। হিন্দি বা ইংরেজি যেসব বুলি দৈনন্দিনে ঢুকে গেছে — তা টেলিশো থেকেই হোক বা অন্য কোনও সূত্রেই হোক — কবিতার মধ্যে তা তো চলে আসতেই পারে, আসবারই কথা। সমসময়ের সঙ্গে একটা যোগ তো রাখতেই চায় কবিতা। সমস্যা হল, যদি কারও মনে হয় এটা তাকে করতেই হবে, কেননা এই হল একটা আধুনিকোত্তর লক্ষণ, তাহলে একটা জবরদস্তির ব্যাপার ঘটতে পারে লেখায়। কবিতা পড়ে কিন্তু বোঝা যায়, কোনটা স্বভাবত আসে আর কোনটা-বা জোর করে চাপানো। স্বতঃস্ফূর্ত এক জৈব সম্পর্কে যদি জড়ানো থাকে সবটা, তবে সমকালীন বুলি কবিতার একটা শক্তিই হতে পারে।

প্র : আপনি একবার লিখেছিলেন, 'মারের জবাব মার' । ওই একবারই অবশ্য । আজও কি বিশ্বাস করেন ও কথাটায় ? কীভাবে এসেছিল লাইনটা ?

উ : কীভাবে এসেছিল তা ঠিক মনে নেই এখন । তবে কথাটার মর্মে এখনও আমার বিশ্বাস নেই, তখনও ছিল না । তবে লিখলাম কেন ? প্রথমত, কবিতার সব কথাই কিন্তু রচয়িতার নিজের কথা নয়, নাট্যচরিত্রের কথা যেমন নয় নাট্যকারের কথা । কবিতায় আমার ও তোমার শব্দগুলির দ্যোতনা মুহুর্মুহু পাল্টে যেতে পারে । আর দ্বিতীয় কথাটা হল, গোটা কবিতা থেকে দুটো লাইনকে আলগা করে নিয়ে ভাবলে অনেকসময় একটা গোলমাল হয়ে যায় । ধরো, এই যে কবিতাটা, দু'-লাইনে গাঁথা বোধহয় দশ-বারোটা লাইন, যার মধ্যে কয়েকবারই ধুয়োর মতো আসছে ওই 'মারের জবাব মার', যে কবিতার নাম 'স্লোগান' — তার শেষ দুটো লাইন মনে আছে তো ? সেটা ছিল 'কথাই কেবল মার খায় না, কথার বড়ো ধার/মারের মধ্যে ছলকে ওঠে শব্দের সংসার ।' তখন কি কথা দিয়ে বা শব্দ দিয়ে মারের একটা পাল্টা শক্তিই তৈরি হল না ? হিংসা-রাজনীতির যে হাওয়া বইছিল সেই সত্তর দশকের গোড়ায়, ওইসব স্লোগানের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল কত 'ব্যক্তি' হয়ে উঠবার সম্ভাবনা, সেই বোধ থেকেই কিন্তু লেখা হয়েছিল ওই কবিতা ।

আমাদের পথের প্রান্তে এক ধ্রুবতারার মত, এক ঈশ্বরের মত, এক নৈতিক গন্তব্যের মত দাঁড়িয়ে থাকেন শঙ্খ ঘোষ । অনেক শব্দ দিয়ে ভারাক্রান্ত করেন না, অমোঘ এক সারল্য আর সংক্ষেপিত ভাষা তাঁর কাছে থেকে আসে, দিক-নির্দেশের মত । আমরা সেই আলোয় পথ চলি ।

রাজনীতির কবিতা নয়, বিবেকের কবিতা, কোলাহলের কবিতা নয়, নৈঃশব্দ্যের কবিতা, অন্যের নিন্দা নয়, নিজেদের ভেতরকার নিহিত পাতালছায়ার কবিতা লিখতেই বলেন তিনি । যেভাবে, এই কবিতাতেও আসলে, এক চূড়ান্ত ইতিহাসচেতনার কথাই, আয়ুর লেখার কথাই বলেন তিনি ।

এত বেশি কথা বলো কেন ? চুপ করো
শব্দহীন হও
শষ্পমূলে ঘিরে রাখো আদরের সম্পূর্ণ মর্মর
লেখো আয়ু লেখো আয়ু
ভেঙে পড়ে ঝাউ, বালির উত্থান, ওড়ে ঝড়
তোমার চোখের নিচে আমার চোখের চরাচর
ওঠে জেগে
স্রোতের ভিতরে ঘূর্ণি, ঘূর্ণির ভিতরে স্তব্ধ
আয়ু
লেখো আয়ু লেখো আয়ু
চুপ করো, শব্দহীন হও

(চুপ করো, শব্দহীন হও)

সংকলন ২০১৯-শে প্রকাশিত

নিজের মতো অন্যরকম

নবকুমার বসু

বাঙালি লেখককূলের মধ্যে তিনি একেবারেই অন্যরকম ... ব্যতিক্রমী এক মানুষ। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। লেখক হতে গেলে, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে তাঁর মধ্যে কিছু না কিছু খানিকটা অন্যরকম ব্যাপার থাকতে হয়। একেবারেই পাতি মধ্যবিত্ত, সংসারজীবী রুটিনমাফিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, মানসিকভাবে সুখী ও আত্মকেন্দ্রিক ... তাঁরা এ জগতে নিজের জীবিকায় অনেক কিছু হতে পারেন। অধ্যাপক - চিকিৎসক - স্থপতি - চার্টার্ড এ্যাকাউনট্যান্ট - বড়বাবু - উকিল - সম্পাদক - ড্রাইভার - মেকানিক - রাধুনি - পুরোহিত - কাউন্সিলর-সঞ্চালক ... আরও কত কি হয়, হওয়ার থাকে সেইসব মানুষদের। তাঁরা বেশ সমঝদার, সপ্রতিভ, ঝকঝকে-চকচকে মানুষ-ও হতে পারেন। কিন্তু কিছুতেই লেখক হতে পারেন না। লেখকের জাত-গোত্র একটু আলাদা হতে বাধ্য। এবং অবশ্যই তা ভাবনাচিন্তা, ধ্যান ধারণার নিরিখে। আবার জাত-গোত্র আলাদা হলেই যে তারা সব পটাপট লেখক বনে যাবে, তাও না। তাহলে আলাদাটা কোথায়! কি রকম আলাদা ... অন্যরকম মানুষ হলে এক একজন লেখক হন!

নাহ্ , জীবিকাটা কোন বাঁধা কিংবা পথ না লেখক হওয়ার জন্য। চোর থেকে পুলিশ কিংবা ডাক্তার থেকে মক্তার ... এমনকী অকর্মা থেকে বিশ্বকর্মা পর্যন্ত যে কেউ-ই লেখক হতে পারেন, যদি ... অনেক কিছু হওয়া কিংবা না-হওয়া সত্ত্বেও সেই মানুষটার কোথাও একটা বিচিত্র উদাস বিস্ময়-কৌতুহল- প্রশ্ন-আবেগ-মুগ্ধতা মাথা খুঁড়ে মরে। কত সময় সে বুঝি সচেতনভাবে জানতেও পারে না কোথাও কী একটা ওলোট-পালট হয়ে যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে ... তার আচরণে অসঙ্গতি প্রকাশ পাচ্ছে, কখনও ব্যবহারে অসামাজিক ... হয়তো কখনো আবার গুম হয়ে বসে থাকা নিস্পৃহ মনে হচ্ছে, কিন্তু ফুটছে আসলে। সব মিলিয়ে কোথায় একটা সরব অথবা নীরব অনুসন্ধান মানুষটার মধ্যে চলছে তো চলছেই ... তারই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিচিত্র সব আয়োজন ... কখনও ক্রোধে, কখনও তিতিক্ষায়, কখনও প্রেমে ... কখনও মদের নেশায় ... এমনকী কি আত্মহত্যা বা হননের চেষ্টাতেও ... তারপর কোথাও বোধহয় একটা তীরভূমি খুঁজে পাওয়ার মত উপলব্ধি ... ।

তিনি মানুষটাকে তো আদ্যন্ত মধ্যবিত্ত, ওপর ওপর শান্ত ও শিষ্ট বলেই লোকে ভাবতে পারতো। কিন্তু তাই কি? মোটেও তা নয়। তাঁর আপত নির্লিপ্ত অথচ ভনিতাহীন জীবন ধারণের মধ্যেই ছিল এক অফুরন্ত দূরন্ত বিশ্বাসের শক্তি। সে-শক্তির কোন আস্ফালন নেই ওপর থেকে ... অথচ চরম নিবেদনে গড় হতে পারে। এই শক্তি তুলনাহীন, ব্যতিক্রমেরও অধিক কিছু। ঠাকুর শ্রী অনুকূলচন্দ্রর পায়ে মাথা ঠেকানোর জন্য সর্বস্ব সমর্পণের যে শক্তি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অর্জন করেছিলেন, তার স্বরূপ কল্পনা সম্ভবত অনেক তথাকথিত এলেমদারের পক্ষে সম্ভব হবে না। হবে না তার কারণ, নিজের বিশ্বাস নির্ভর এই নিখাদ সমর্পণ এবং শক্তির অনুভবে স্বাক্ষরিত হতে না পারলে, কোন এলেম দিয়েই তার নাগাল পাওয়া যায় না, যাবে না। আসলে এই পুরো ব্যাপার-টাই কিন্তু ঠাকুর - পুজো - ধুপধুনো - প্রণাম - অংবং মন্ত্রপাঠ -ফুলচন্দন ... ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সঙ্গে তাঁর ওই সম্বন্ধ একটা উপলব্ধি। সেটা উঠে আসে নিজের ভেতর থেকে। একজন লেখকের পক্ষে এমন একজন গুরু ঠাকুরের সঙ্গে নিবিড় আত্মযোগ বেখাপ্পা মনে হতে পারে। তাইতে কিছু যায় আসে না। যে কোনো বিরল ব্যতিক্রমই আসলে বেখাপ্পা, উল্টোপাল্টা, কারো-কারো ক্ষেত্রে অসামাজিক বলেও মনে হতে পারে, কিন্তু লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকের সেটাই ভূষণ। সেই ভূষণের আর এক নাম বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস তাঁকে একটি আলাদা পরিচিতি দেয়, উত্তরণ ঘটায়।

বাঙালি লেখককুলের মধ্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এক বিরল, ব্যতিক্রমী, বিশ্বাসী মানুষ। তথাকথিত লোক দেখানো গ্ল্যামার এবং ভড়ংহীন তিনি। তাঁর অধিকাংশ মূল রচনাগুলোর মধ্যেও, খেয়াল করলে টের পাওয়া যায়, অদ্ভুত এক

নিরাসক্ত, নিরাড়ম্বর আবহের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতেই উচ্চারণ করে গেছেন জীবনের পরম সত্যকে। তাঁর লেখায় যেন মার নেই, ধাক্কা নেই, চমকে দেওয়া নেই, বরং মাঝেমাঝে বেশ কৌতুকাশ্রয়ী-ও, অথচ কোথাও তা জীবনের সত্যকে ছুঁয়ে দেয়ার জন্যই এগিয়ে চলেছে। তার অধিকাংশ রচনাই যেন সেই অর্থে ঘুণপোকা – উচ্চকিত ঘোষণা নেই, কিন্তু প্রাণে, হৃদয়ের গভীরে সেঁধোয়। আবার একইসঙ্গে একটি ছটফটে, প্রাণবন্ত, কৌতুহলী, সজাগ মনও – যে তাঁর লেখার মধ্যে ক্রিয়াশীল তাও সচেতন পাঠকের নজর এড়ায় না।

লেখক-সাহিত্যিকদের অনেকে একটু দূরের মানুষ মনে করেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মত খ্যাতিমান, আবার একদিকে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রর পরম শিষ্য এবং নিজেও সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, নিরামিষাশী ... এহেন মানুষকে তো আরও দূরের বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আমারও তাই হতো। দেশ-পত্রিকা অফিসে মাঝেমধ্যে কখনও তাঁকে দেখেছি, কাছে যেতে সংকোচ বোধ করেছি নেহাতই নিজেকে ম্লেচ্ছ ভেবে নিয়ে। তিনিও আমায় চিনতেন না; কিন্তু বলা যায় না মুখের সাদৃশ থেকে পিতৃ পরিচয় পড়তে পারতেন কি না। কিংবা আলাপ করতে যাওয়ার দুঃসাহস বা চ্যাংড়ামি কখনই সম্ভব হয়নি। অথচ খুব ইচ্ছে করতো – এই একজন লেখককেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আসতে। কিন্তু সাত্ত্বিক মানুষ ... যদি পা সরিয়ে নেন !

তাঁর কলকাতার বাড়ি ও আমার বাসস্থান থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে ছিল। খুব ইচ্ছে করলেও কখনও যেতে পারিনি, মনে হয়েছে, আবেগ জানাতে গিয়ে লেখকের সময় নষ্ট করব ! আর সেই সুযোগ টাই ঘটে গেল দু-হাজার দশ সালে সুদূর আমেরিকায়, আটলান্টিক সিটি-র বঙ্গ সন্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে। শীর্ষেন্দুমুখোপাধ্যায় এসেছেন কলকাতা থেকে, আমি গেছি লন্ডন থেকে। আরও বহু মানুষের ভিড় নিউজার্সির বঙ্গ সন্মেলনে। একদিকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়েই বসেছিলেন তিনি। এগিয়ে গেলাম। বিদেশ বিভূঁইয়ে কিছুটা বেপরোয়ার মতোই প্রণামটা সেরে ফেললাম ... সেই সঙ্গে সম্বোধনেও 'শীর্ষেন্দুদা'। মনে আছে, এরপর হোটেল-এ তাঁর ঘরে বসে বোধহয় একটানা দু-আড়াই ঘণ্টা ... যাকে বলে একেবারে জমজমাট আড্ডা দিয়েছিলাম। কিংবা জানি না হয়তো এমনও হতে পারে – আমি অর্বাচীনের মতো বকবক করে গেছি, আর তিনি স্নেহের প্রশ্রয়ে তা মেনে নিয়েছিলেন।

ইদানিং প্রবাস থেকে কলকাতায় গেলে মাঝেমধ্যে কোন সভায় তাঁকে দেখতে পাই। প্রণাম করার লোকজন কমে গেছে বলেই দ্রুত তাঁর কাছে এগিয়ে যাই। তিনি প্রগলভ হন না, কিন্তু প্রণামের প্রত্যুত্তরে সহাস্যে মাথায় হাতটা ছুঁইয়ে দেন। আমি যেন কোথাও একটা স্নিগ্ধতার স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই। মনে মনে বলি, এটুকু করুণাই আমার পরম প্রাপ্তি।

বাঙালির প্রিয় শংকর

সিদ্ধার্থ দে

তখন একটু একটু পড়তে শিখেছি। পড়তেই শিখেছি। কি পড়ছি অনেক সময়েই বুঝতে পারতাম না।

বাড়ীতে সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকা আসত। যদিও সেটা ছিল "বড়দের" পত্রিকা, উল্টে পাল্টে দেখতে বারণ ছিলনা। পত্রিকাটির শেষের দিকের কটা পাতায় খেলা সংক্রান্ত লেখাগুলি থাকত। মোহনবাগান ও ক্রিকেটের ভূতটা সেই সময় থেকেই মগজে মননে আস্তানা বাঁধতে শুরু করেছে। এক ফাঁকে সেগুলো পড়ে নিতাম।

"চৌরঙ্গী" নামে একটা ধারাবাহিক বেরোচ্ছিল তখন। লেখকের নাম শংকর। উপন্যাস পড়ার মত বিদ্যে বা বয়স তখনো হয়নি।

শংকরের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

***   ***   ***

বছরখানেক বাদে অনেক বাড়ীতেই দেখতাম "চৌরঙ্গী" নামে এক সুদৃশ্য মলাটের বই।

ততদিনে বয়স আরো কয়েক বছর বেড়ে গেছে। পড়াতেও অনেক স্বচ্ছন্দ। বাড়িতে শরৎচন্দ্র রচনাবলী ছিল। বেশ কয়েকটা উপন্যাস পড়ে ফেলেছি। খুঁটিনাটি অনেক কিছুই বুঝতাম না – কিন্তু শরৎবাবুর সাবলীল লেখার জন্য গল্পের মূল স্রোতে গা ভাসাতে অসুবিধা হত না। "বড়দিদি", "নিষ্কৃতি" বেশ লেগেছিল। তবে "পথের দাবী" বা "চরিত্রহীন" বিশেষ মাথায় ঢোকেনি।

কবে যেন হাতে পেলাম "চৌরঙ্গী" । পাতা ওলটাতে ওলটাতে প্রায় অজান্তেই পড়তে শুরু করে দিলাম। শরীরে মনে কেমন একটা আবেশ লাগছিল। অবশ্যই এঁচোড়ে পাকা ছিলাম – নয়তো একটা এগারো বছরের বালকের ঐ বই বোঝার কথা নয়। ম্যাজিকটা বোধহয় সহজ ভাষা আর উপস্থাপনার মুন্সীয়ানাতে।

ইংরেজদের ছিবড়ে করা দেশটা তখন বছর কুড়ি মাত্র স্বাধীন হয়েছে। দারিদ্রের ছাপ সর্বত্র। বড়দের কথাবার্তায় শুনতাম মধ্যবিত্ত বলে একটা শ্রেণী আছে। আমরা নাকি সেই দলের। কথাটার মানে ঠিকমত না বুঝলেও এটুকু বুঝতাম অনেক কিছুই আমাদের নাগালের বাইরে। নামকরা অভিজাত রেঁস্তোরাতে খাওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। সিনেমা দেখতে গেলে ১ টাকা ৪০ পয়সা দামের টিকিটই আমাদের জন্য, স্ক্রিনের একদম সামনে ৬৫ পয়সা বা পেছনের সারির ২ টাকা ৮০ নয়।

সেই আমলে শংকর বাঙালি মধ্যবিত্তকে দেখালেন শাজাহান হোটেলের অন্দরমহল। এক অজানা, রহস্যময় দুনিয়া। পরিচয় করিয়ে দিলেন ফ্রন্ট ডেস্কের স্যাটা বোস, বেহালাবাদক গোমেজ, ক্যাবারে নর্তকী কনি, সমাজের ওপর মহলের মিসেস পাকরাশির সঙ্গে।

পর্দার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে বড়দের জগতের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এই "চৌরঙ্গী" দিয়েই। প্রথম প্রকাশের ষাট বছর পরেও বইটি সমান জনপ্রিয়। ১১১ টি সংস্করণ এখনো অবধি প্রকাশিত হয়েছে। চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে ১৯৬৮ সালে। শংকরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। স্যাটা বোস আর কেউ নন – খোদ উত্তমকুমার।

***   ***   ***

শংকরের জন্ম ১৯৩৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর যশোরের বনগাঁতে – প্রবাদবাক্য অনুযায়ী সেখান কার রাজা নাকি শেয়াল। পোশাকি নাম মনিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। বাবা হরিপদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আইনজীবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগেই চলে যান কলকাতার ওপারে হাওড়ায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বাংলা ভাষার অন্যতম সাহিত্য পত্রিকা "দেশ" এর প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩ সালের ২৪শে নভেম্বর। কাকতালীয়ভাবে তারিখটি শংকরের জন্মের মাত্র পক্ষকাল আগে।

এই পত্রিকাতেই শংকরের আত্মপ্রকাশ। "কত অজানারে" প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিক ভাবে ১৯৫৩ সালে। লেখক সদ্য টিনেজ ছাড়িয়েছেন। কাহিনীটি প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এত অল্প বয়সে পরিচিতি পাওয়ার সৌভাগ্য খুব বেশী সাহিত্যিকের হয়নি। অন্তত বাংলা সাহিত্যজগতে তো নয়ই। হলেও আমার অন্তত জানা নেই।

*** *** ***

শুনেছি "কত অজানারে"র অভাবনীয় সাফল্যের পরে শংকরের পরবর্তী কিছু লেখা পাঠকমহলে সেভাবে সমাদৃত হয়নি। মনে হয়, বারওয়েল সাহেবের সেই আইকনিক কাহিনীর পর পাঠকের প্রত্যাশা বেড়ে গিয়েছিল। সাফল্যের হাত ধরে আসে নিন্দুকেরা। কয়েকজন বলতে শুরু করলেন শংকর "ওয়ান বুক অথর"। (বাংলা সাহিত্যে এরকম বেশ কয়েকজন আছেন – একটি সৃষ্টিতেই যাঁদের পরিচিতি। যেমন যাযাবরের "দৃষ্টিপাত", রঞ্জনের "শীতে উপেক্ষিতা", মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "দক্ষিণের বারান্দা"।) শংকর অন্নদাশঙ্কর রায়কে শান্তিনিকেতনে "কত অজানারে" পাঠিয়েছিলেন। তাতে উনি লিখে দেন, "আপনার জীবনের প্রথম সাফল্যটি যেন জীবনের শেষ সাফল্য না হয়"। এই প্রসঙ্গে শংকর বলেছেন : "আজও জানিনা আশীর্বাদ না আশঙ্কা কোন সেন্টিমেন্ট থেকে কথাটা লিখেছিলেন।" বাংলা সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য, অন্নদাশঙ্করের আশঙ্কা সত্যি হয়নি।

যে কোন সৃজনশীল মানুষের পক্ষেই এই পরিস্থিতি অসহনীয়। অনেক সাহিত্যিক, সুরকার, অভিনেতাকেই জীবনের কোন না কোন সময়ে এই অস্তিত্বের সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অনেক বেদনা বুকে নিয়ে সলিল চৌধুরী গান বেঁধে ছিলেন "নিজের ছায়ার পিছে ঘুরে ঘুরে মরি মিছে ..."। শংকরকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছিল শাজাহান হোটেলের অভ্যন্তরের নানা কাহিনী।

*** *** ***

"চৌরঙ্গী" উত্তম পুরুষে লেখা। ধরেই নিয়েছিলাম লেখক কোন হোটেলের কর্মজীবনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন করেছিলেন "কত অজানারে" তে বারওয়েল সাহেবের কনিষ্ঠ কেরানী থাকার দিনগুলিকে।

সম্প্রতি জানলাম, শংকর কোনদিনও হোটেলে চাকরি করেন নি। সেই সময়ের "স্পেনসেস" হোটেলে নিয়মিত যাতায়াত করে সেখানের কর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন। স্পেনসেসের কিছু কর্মী পরবর্তীকালে গ্রেট ইস্টার্নে যোগ দেন – সেখানেও যেতেন। মোটের ওপর, উপন্যাসটি মন গড়া নয়, বা লাইব্রেরীতে বসে রিসার্চ করা নয়। একদম "ঘোড়ার মুখ" থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। সেইজন্যই বইটি বিশ্বাসযোগ্যতার মাপকাঠি উত্তরণ করেছে বিনা ভ্রুকুটিতেই। অবশ্য, সমস্ত তথ্য সামনে ফেলে দিলেও সবাই "চৌরঙ্গী" লিখতে পারবে না!

শংকর একদিক দিয়ে সমকালীন সাহিত্যিকদের অনেকের থেকেই কিছুটা আলাদা। বিস্তারিত ভাবে জানিনা – তবে উনি সারাজীবনই চাকরি করেছেন কোথাও না কোথাও। শুনেছি, কোন এক নামী বেসরকারী সংস্থায় জনসংযোগ বিভাগে কাজ করেছেন। ব্যবসা সংক্রান্ত আইনকানুনের সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ফুটে ওঠে ওনার নানা লেখায়। ওনার অনেকগুলি লেখার পটভূমি কোন কর্মস্থল। সেখান থেকে উঠে আসে অফিসের কূটকাচালি, মানুষের বেদনা, আশা

আকাঙ্ক্ষা। ঘটনাবলীর কিছুটা হয়তো কল্পনা, (আমার বিচারে কিছুটা অতিনাটকীয়তা দোষে দুষ্ট ক্ষেত্রবিশেষে) কিন্তু বাস্তব থেকে বিচ্যুত নয় কাহিনীগুলি। নিজের কর্পোরেট জীবনে বেশ কিছু উচ্চাকাঙ্খী নারী পুরুষ দেখেছি, দেখেছি নানা ধরণের নীচতা – তাই "সীমাবদ্ধ"র রুনু সান্যাল বা শ্যামলেন্দু বেশ চেনাই। একইরকম ভাবে পরিচিত "জন অরণ্য"র সোমনাথ বা নটবর মিত্তির।

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে শংকর "সাহিত্য একাডেমী" পুরষ্কার পেলেন ২০১৭ সালে। কাউকে ছোট না করেও বলব, এই পুরষ্কার ওনার বহু আগেই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু আর একটা বিরাট পুরষ্কার উনি পেয়েছেন। সত্যজিৎ রায় উপরোক্ত দুটি উপন্যাস অবিস্মরণীয় ভাবে চিত্রায়িত করেছেন – "জন অরণ্য" ও "সীমাবদ্ধ"। যতদিন মানুষ সত্যজিত চর্চা করবে সঙ্গে থাকবেন হাওড়ার মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। বর্তমান কালের সাহিত্যিকদের মধ্যে এই দুর্লভ সম্মান প্রাপ্তি কেবল মাত্র আর একজনেরই হয়েছে – সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ("প্রতিদ্বন্দ্বী" এবং "রণ্যের দিনরাত্রি")।

প্রায় সত্তর বছর ধরে বাঙালি পাঠকদের কাছে শংকর লাগাতার জনপ্রিয়। রসায়নটা কি? ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হয় শংকর কোন দূর জগতের বাসিন্দা নন। উনি যেন পাশের বাড়ির কোন দাদা বা কাকু। সৃষ্ট চরিত্রগুলিও যেন খুব চেনা চেনা। বহুদিন আগে "যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ" নামে একটা বই পড়েছিলাম ওনার। অশ্রুমামা নামে এক চরিত্র ছিলেন। তাঁর ভালো লাগা না লাগা, জীবনের ছোটখাট স্বপ্ন বা চাহিদা সবই গড়পড়তা বাঙালির। পড়তে পড়তে হঠাৎ কখন যেন একাত্ম হয়ে গেলাম চরিত্রটির সাথে। এমন অনেক চরিত্র উপহার দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যকে শংকর।

আমার পড়া ওনার অন্যান্য বইগুলির মধ্যে খুবই ভাল লেগেছে "বোধোদয়", "এপার বাংলা ওপার বাংলা", "রূপতাপস" এবং "নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরী"। দৈর্ঘের প্রতি খেয়াল রেখে এই প্রবন্ধে আলোচনা এই চারটি বইতেই সীমাবদ্ধ রাখলাম। প্রতিটি লেখাই ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন পটভূমিকায়।

"বোধোদয়" বইটির বিষয়ে আমার একটা ব্যক্তিগত স্মৃতি আছে। আমার প্রয়াত দাদার খুব একটা বই পড়ার অভ্যাস ছিল না। তবে যে কটা পড়েছে খুঁটিয়ে পড়েছে – মাসের পর মাস ধরে। এমনই একটা বই হল "বোধোদয়"। শুধু পড়েছে বললে ভুল হবে, বইটি একেবারে ওর জীবনাদর্শের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। বহু কোটেশন দিত বইটি থেকে। যার একটি ছিল (স্মৃতি থেকে লিখছি) : "প্রত্যেক মানুষেরই একটা সুইচ থাকে। সেটি খুঁজে পেলেই অর্ধেক কাজ হয়ে গেল!" আমার দাদাটি পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ছিল – বাবার ফার্মটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। মক্কেলের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ওর জীবনকালে অনেকটাই চট করে মানুষের "সুইচ" খুঁজে পাওয়ার দক্ষতার দৌলতে। একটা লঘু উদাহরণ দিলাম বটে, কিন্তু শংকরের বহু লেখাতেই লুকিয়ে আছে জীবনের পথে চলার এমন অনেক অমূল্য টিপ্স।

"রূপতাপস" দীনবন্ধু ঘোষ নামে এক ভাস্করের জীবনের কাহিনী। দীনবন্ধু নিজের এক মডেলকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর স্ত্রীকে কখনো মডেলরূপে ব্যবহার করেন নি। এই প্রসঙ্গে লেখকের উক্তিটি মনে গেঁথে আছে: "মডেলকে বৌ করা চলে, কিন্তু বৌকে মডেল নৈব নৈব চ!" একটু সমান্তরাল উপমা টেনে বলব – প্রেমিকাকে স্ত্রী করা চলে, কিন্তু স্ত্রীকে প্রেমিকা রূপে পাওয়া বেশীর ভাগ স্বামীর ভাগ্যেই ঘটে না! সান্ধ্য আড্ডায় আলটপকা মন্তব্যটি করে বারকয়েক একই সাথে পুরুষদের হাততালি পেয়েছি এবং মহিলাদের বক্রোক্তি হজম করেছি!

১৯৬৬ সালে রচিত "নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি" শংকরের আর এক কালোত্তীর্ণ উপন্যাস। এই নাতিদীর্ঘ উপন্যাসটির কেন্দ্রে আছেন বিজ্ঞানের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এক বাঙালি বিজ্ঞানী জীমূতবাহন। সহজ ভাষায় তর তর করে এগিয়ে যাওয়া এই কাহিনীতে নিজের পেশায় মগ্ন, অর্থের বা ক্ষমতার প্রতি উদাসীন বহু মানুষ নিজেকে খুঁজে পাবেন। এই আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই ঘটায় পারিবারিক জীবনে নানারকমের সংঘাত। অর্ধ শতাব্দ পূর্বের এই সৃষ্টিতে লেখকের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি আজও প্রাসঙ্গিক।

"এপার বাংলা ওপার বাংলা" বাংলা সাহিত্যের একটি মাইলফলক বিশেষ। রচনাকাল ১৯৭০। বর্তমানের বাংলাদেশকে সেই সময়ে আমরা পূর্ব পাকিস্তান বলেই জানতাম। মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে বিলেত ও আমেরিকা ভ্রমণকালের নানা উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন লেখক এই অনবদ্য রচনায়, যেটির একটি অন্যতম সুর হল দুর্ভাগ্যজনক ধর্মভিত্তিক বিভাজন সত্ত্বেও দুই বাঙলা আদতে একই সুতোয় বাঁধা।

গত কয়েক বছরে উপন্যাস সেরকম একটা লেখেন নি এই বর্ষীয়ান সাহিত্যিক। অধিকাংশ লেখাই স্মৃতিচারণধর্মী বা বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ। কিছু বড় গল্প বা রম্যরচনাও লিখেছেন অবশ্য। প্রবাসে থাকলেও চেষ্টা করি প্রায় সমস্ত পূজা সংখ্যা আনাতে। শংকরের লেখা দেখলে আগে ভাগে পড়ে ফেলি। লেখাগুলির দৈর্ঘ কমেছে বটে, কিন্তু স্বাদ অপরিবর্তিত। দিন কয়েক আগে বাংলার কিংবদন্তি মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের উপর নানা অজানা তথ্য সমৃদ্ধ একটি চমৎকার নিবন্ধ পরলাম।

*** *** ***

নব্বুই-টির উপর উপন্যাস লিখেছেন। বলাই বাহুল্য, সবকটি "চৌরঙ্গী"র বা "কত অজানারে"র সাফল্য বা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। আমি খান কুড়ি পড়েছি। সত্যি কথা বলতে, সব লেখা ভাল লাগেনি। অনেক উপন্যাসেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত মেলোড্রামা পেয়েছি – শেষ হয়েছে বেশ নাটকীয়ভাবে। বিশেষ করে বিভিন্ন পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি লেখা। তবে বড় লেখকদের শুনেছি বছরের এই সময়ে ফরমায়েসী লেখা তড়িঘড়ি শেষ করতে হয় – ফলে সব লেখা প্রত্যাশিত মানে পৌঁছয় না। শুধু শংকর নয়, সুনীল শীর্ষেন্দুরও পুজো সংখ্যার কিছু চটজলদি লেখা বেশ সাধারণ লেগেছে। বিদেশী "বড়" লেখকরা যেখানে তিন বছরে একটি উপন্যাস লেখেন, এনারা গড়ে বছরে তিনটি লিখতে বাধ্য হয়েছেন – হয়তো পেটের দায়েই। তবুও রচনাশৈলীর গুণে এই লেখাগুলিও অনুরাগী পাঠকরা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলেন।

*** *** ***

আমাদের প্রজন্মের সাহিত্যচেতনা জাগার শুরুর দিকে যাঁরা প্রভাবিত করেছিলেন তাঁদের অনেকেই চলে গেছেন – সুনীল, শক্তি, রমাপদ চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সত্যজিৎ রায়, সমরেশ বসু সবাই প্রয়াত। সম্প্রতি বিদায় নিলেন শঙ্খ ঘোষ। যাঁরা এখনো আছেন তাঁদের মধ্যে শংকর (৮৭) প্রবীনতম। আর আছেন শীর্ষেন্দু (৮৫), সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (৮৫), বুদ্ধদেব গুহ (৮৪) এবং সমরেশ মজুমদার (৭৯)।

এঁদের কারোর সঙ্গেই শংকরের সেরকম অন্তরঙ্গতা ছিলনা। কবি সাহিত্যিকদের আড্ডা "বুধসন্ধ্যা"তে কোনদিনও যাননি। এক সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গের প্রশ্নগুলি পাশ কাটিয়ে গেছেন। "খুব বেশি যাতায়াত ছিল না। আসলে সেই হাওড়া থেকে বাসে-ট্রামে যাতায়াত করে, চাকরি করে হয়ে ওঠেনি। [তাছাড়া] আমি একটু লাজুক লোক। এড়িয়ে গেছি বোধহয়। এ সব নিজে থেকে যেতে-টেতে হয়।"

আসলে উনি ব্যতিক্রমী। তাই বোধহয় একটু আলাদাই থেকে গেছেন সারাজীবন। সৃষ্টিগুলিও ভিন্নধর্মী। অন্য ধারার। চৌরঙ্গী সিনেমাতে স্যাটা বোস রূপী উত্তমকুমারের লিপে মান্না দে'র কণ্ঠে একটি কালজয়ী গান ছিল: "বড় একা লাগে এই আঁধারে ..."। কিছুটা নিঃসঙ্গই রয়ে গেলেন মনিশঙ্কর। পেয়েছেন তো অনেক কিছুই সাহিত্যজীবনে। তবুও ... একটু অভিমান বুকে চেপে রেখেছেন কি ?

"চৌরঙ্গী" উপন্যাসের শেষের দিকের একটা লাইন: "শাজাহান হোটেলের লাল আলোগুলো তখনও জ্বলছে, নিভছে।" উপরোক্ত সাক্ষাৎকারে শংকর লাইনটির উপর একটু আলোকপাত করেছিলেন। "মানে জীবনের শেষ হল না এখানে।" উনি আরো অনেকদিন থাকুন আমাদের মাঝে। চলুক কলম।

উৎসারিত আলো (জুলাই ২০২৫)-শে প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথ : একটি গান জীবনে ও যাপনে

দীপেশ চক্রবর্তী

ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় একসময় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছিলেন, “an artist in life”. ব্যক্তিগত জীবন কাটাতে গিয়ে আমার অনেক সময় মনে হয়েছে, “ইন” কথাটা বদলে “অফ”-ও হয়তো লেখা যেত। তিনি জীবনেও শিল্পী, জীবনেরও শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান বারবার শুনতে বা গাইতে গিয়ে মনে হয়, গান যেন তাঁর জীবনচর্যার অঙ্গ। নিজের দৈনন্দিন জীবনটাই যেন একটা প্রস্তরখণ্ড এবং ছেনি আর হাতুড়ি নিয়ে ঠুকে ঠুকে তাকে একটা ঈপ্সিত আকার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যে মানুষটির হয়তো অন্যান্য বাঙালির চেয়ে অহংকারে অনেক বেশি অধিকার ছিল, যাঁর মধ্যে অহংকার দেখলে আমরা সে অহংকারকে হয়তো ন্যায্য বলে মেনেও নিতাম, তিনি কেন কাতর হয়ে প্রার্থনা করতেন, “সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে”? ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর একটি অতি পরিচিত কথা মনে পড়ে, কেয়ার অব দ্য সেলফ। ফুকো সেখানে বলছেন, “উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট আওয়ারসেলভ অ্যাজ আ ওয়ার্ক অব আর্ট”। আমাদের জীবনটাকেও শিল্পবস্তু করে তুলতে হয়।

নিজেকে নিয়ে কী করব ? যতই বয়স হয়, জীবনের প্রান্তদেশে এসে পৌঁছাই, তত নিজের মধ্যে, অন্যের মধ্যে ঔদার্য ও কারুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষী ক্ষুদ্রতা ও খর্বতারও সন্ধান পাই প্রতিদিন। তখন ভাবি জীবনের শেষে যে ছোট্ট ডিঙি নৌকা আমার মতো নগণ্য মানুষের কাছে আসবে – সোনার তরীর প্রশ্ন তো আর ওঠে না – তাতে করে আমার সামান্য জীবনের আহরণের কী তুলে নিয়ে যাবে সেই ডিঙি নৌকার মাঝি ? যে মানুষী প্রবৃত্তিতে প্রায় – স্বাভাবিকভাবে প্রতিদিন ক্ষুদ্রতার ও খর্বতার হলাহল উঠে আসে, সেই বিষ রাখার জায়গা তো ওই ছোট নৌকাটিতে নেই !

এই প্রশ্নের বিচার করতে গিয়ে সেই রবীন্দ্রনাথেরই শরণাপন্ন হতে হয়। কারণ তিনি শুধু কবি নন। শুধু কর্মীও নন। বরং অনেক সময়েই মনে হয়, প্রার্থনা ও পূজা পর্যায়ের অনেক গানে “তুমি”, এই অন্তরঙ্গে সম্বোধনে “ঈশ্বর” বা “অসীম”-এর সঙ্গে যে একাধারে প্রকাশ্য অথচ একান্ত ব্যক্তিগত কথোপকথন সকলের হয়ে, সকলের জন্য তিনি করেন, তাতে যেন আমাদের এই মানুষী ও সাংসারিক জীবন কীভাবে যাপন করতে হবে তারই নানান ইঙ্গিত রেখে যান রবীন্দ্রনাথ। এখানে আমি তাঁর যে গানগুলো মন্ত্রের মতো “বিপদে মোরে রক্ষা করো”, “সংকোচের বিহ্বলতা” অথবা “একলা চলো রে” তার কথা বলছি না। মন্ত্র ম্যাজিকের মতো কাজ করে। সেই “মধুসূদন দাদা”র কথা বা “জয়মণি স্থির হও”-এর মতো শব্দবন্ধ মনে করিয়ে দেয়। সেগুলো তো আছেই, এবং সেখানে সাহসের প্রশ্ন আছে অবশ্যই, কিন্তু সেখানে যাপনের প্রশ্ন নেই। বিপদে পড়লে কারও শরণ নেওয়া একটা আপৎ-ধর্মের মতো। আমি বলছি রবীন্দ্রনাথের

সেই সব গানের কথা যা আমাদের প্রতিনিয়ত নিজের স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতার সঙ্গে লড়াই করতে সাহায্য করে। এমনি একটি গান আজ কিছুদিন হলো আমাকে পেয়ে বসেছে।

গানটি হলো, "আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে"। প্রভাতকুমার জানাচ্ছেন ১৯১৩ সালে লেখা গান, ব্রাহ্মসমাজে গীতও হয়েছে, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মাস খানেক আগের রচনা হয়তো। গানটির "তুমি" কে? রবীন্দ্রনাথের কাছে নিশ্চয়ই ঈশ্বর। গানটি কীভাবে আমার মতো একজন নিরীশ্বরবাদী বা অন্তত অজ্ঞেয়বাদীকে পেয়ে বসল, সেটাই একটু বলি। প্রথমত, ঈশ্বর বা ধর্ম সম্বন্ধে আমার মতামত যাই হোক, আমি হিন্দুধর্মের অনুষঙ্গে বড় হয়েছি। নামগান, নামসংকীর্তন ইত্যাদির সঙ্গে আমি ছোটবেলা থেকেই পরিচিত। নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমার একটা বোধ আছে। তাছাড়া আমি এটাও মনে করি যে – ঈশ্বর, ভগবান, ঠাকুর ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন মনোভাব যাই হোক না, ধর্মের নানা আচার-ব্যবহারের সঙ্গে – যদি আমরা তারই মধ্যে বড় হয়ে থাকি – আমার মতো মানুষের একটি অচেতন বা অভ্যাসগত সম্পর্ক থাকে।

ধর্মানুভূতি আমার অজানা কিছু নয় এবং তার বিরুদ্ধে আমার মনে কোনো বাধা বা প্রতিরোধ গড়ে তোলা নেই। আর নামগান নিয়ে রবীন্দ্রনাথও গান লিখেছেন। খুব বিখ্যাত সেই অন্য গানটি, "তোমারি নাম বলবো, বলবো নানা ছলে" ইত্যাদি। এখানে "নামের নেশা" কেমন বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "শিশু যেমন মাকে/নামের নেশায় ডাকে/বলতে পারে সেই খুশিতে মায়ের নাম সে বলে"। নামের নেশা আমি জানি। প্রেমে যিনি পড়েছেন, তিনিই জানেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সম্বোধনে আমার কোনো অসুবিধা হয় না। ঈশ্বর বলতে আমি ধরে নিই যে আমার প্রাত্যহিকের মানুষী সংসারে লিপ্ত ক্ষত-বিক্ষত ক্ষুদ্র "আমি"র চেয়ে অনেক বড়, রবীন্দ্রনাথ যাকে অন্যত্র "অসীম" বলেছেন, তেমন কিছু। এই সকল-বহা, সকল-সহা পৃথিবীর মতো, যাকে না হলে আমার চলে না, কিন্তু আমাকে ছাড়া যার দিব্যি চলে যায়।

গানটিতে এই অসীমকে আমাদের সীমিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, সব কাজেকর্মে, ঘুমে, জাগরণে নিবিড় করে পাওয়ার প্রার্থনা আছে। কথায়, নীরবতায়, প্রায় প্রেমানুভূতিতে রক্তধারার ছন্দে, দেহবীণার তারে, নিদ্রায়-জাগরণে, আকাঙ্ক্ষা-আশায়, কাজে-ভালোবাসায়, যেন সেই দয়িতের নাম কীর্তিত হয়। গানটির কয়েকটি লাইন আমার বিশেষ প্রিয়। কবি চান যে সেই কাঙ্ক্ষিত অসীমের দেবতা যেন গানটির "আমি"কে মমতায় ঘুমে-জাগরণে রক্ষা করেন : "ঘুমের" পরে জেগে থাকুক নামের তারা তব/জাগরণের ভালে আঁকুক অরুণলেখা নব"। প্রেমের ভেতরে বহমান বাৎসল্য রস। আমাকে খুব আবিষ্ট করে তার পরের দুটি লাইনও। "সব আকাঙ্ক্ষা-আশায় তোমার নামটি জ্বলুক শিখা"। আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়েই আমাদের জাগতিক, সাংসারিক জীবন গড়া; কিন্তু তার মধ্যেও যেন সেই অসীমের নাম একটি শিখার মতো জ্বলে। পড়লেই আমার মনে হয়, এই শিখা তো শুধু জ্বলছে না, যা কিছু মলিনতার আবর্জনা – তাকে পুড়িয়ে ফেলছে, আবার যেন একই সঙ্গে দীপ হয়ে পথও দেখাছে। এ কথা বলেই কবি ফিরে আসেন নিজের ভালোবাসার প্রশ্নে। আমাদের ভালোবাসা সচরাচর সাংসারিক হয়ে স্বার্থের সঙ্গে, সম্পত্তির সঙ্গে, ছেলেপুলের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ উল্টোটা চাইছেন "সকল ভালোবাসায় তোমার নামটি রহুক লিখা"। অর্থাৎ, আমার সব ভালোবাসায়ও যেন সেই অসীমের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়।

গানটি শেষ হয় মৃত্যুর সীমানায় এসে। জীবন ভরে এই নামের মধু সঞ্চয়ন করে মৃত্যুর সময় সেই দানই যেন সারা জীবনের সঞ্চয় বলে দাতাকে ফিরিয়ে দিতে চান কবি :

"জীবনপদ্মে সংগোপনে রবে নামের মধু
তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে তোমারি নাম বঁধু"।

এখানে মৃত্যুও প্রেমঘন। লাইনগুলো যেন আমাকে বলে, যখন আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের জন্য রাখা সেই ডিঙি নৌকাখানি আসবে, তখন যেন সেই অসীমের – কথা - বলে এমন কোনো সঞ্চয় আমার এই সামান্য জীবনে হয়ে থাকে। গানটির শেষে এসে এমন একটি প্রার্থনাই আমার ভেতর বেজে ওঠে। "বেজে ওঠে" বললে ভুল হয়, রবীন্দ্রনাথ বাজিয়ে তোলেন।

গানটায় "প্রেম" যে মিশ্র রসে তৈরি সে কথা বার বার বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের বাখানে অনেক সময়েই – হয়তো সব সময়েই – গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বে মজে ভাবতেন। এবং প্রেমের মধ্যে যে মৃত্যু তা মধুর রসে জারিত বলে মনে করতেন। যেমন "মধুর তোমার শেষ যে না পাই" গানটা। জীবনের শেষ আছে, কিন্তু প্রেম মিশে যায় যে মধুরে, সেই মধুরের শেষ নেই। আবার অন্যত্র লিখছেন, "ধরণীর মাঝে কয়েকটি সুর/রেখে দিয়ে যাবো করিয়া মধুর/তারপর ছুটি নিব"। এখানেও সেই মধুরে শেষ। (আমাদের খাওয়ার মধ্যে এই রসতত্ত্ব মিশে আছে, যে কারণে আমরা মধুরেণ সমাপয়েৎ বলি)। এমনকি সেই যে লাইন, "বঁধুরে যেদিন পাবো, ডাকিব মহুয়া নাম ধরে", সেখানেও সেই মহুয়ার উল্লেখে মধুর রসের আভাস।

আমি বলব, জীবনপদ্মের সঞ্চয় যদি নামের মধুটুকুই হয় – এখানে কার্যত "নাম" আর "নামের মধু" এক মনে হয় – তখন দেবার সময় তাঁর কাছ থেকে যা আমি পেয়েছি – নামের মধু (= নাম, এ ক্ষেত্রে) – সেটাই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। মনে রাখতে হবে, আমি আমার দয়িতের সৃষ্টি। দয়িত আমার বঁধু ঠিকই, কিন্তু এখানে আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। আমার মতো করে ভাবলে কথাটা খানিকটা "সোনার তরী"র সঙ্গে মিলে যায় : আমার জীবন সঞ্চয়ের সেটুকুই তরীতে উঠবে, যেটুকু সোনার ধান – "আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি"। এ ক্ষেত্রে যেটা "আমার" জীবনে ফলানো সোনার ধান, সেটা আমার/কবির জীবনে সঞ্চিত "নামের মধু", অর্থাৎ তাঁরই মধুময় উপস্থিতির প্রকাশ।

বাইশে শ্রাবণ

সুবোধ সরকার

আমরা প্রত্যেকে আজ বাইশে শ্রাবণ।

আমি সান্তিয়াগো গিয়েছিলাম
পাবলো নেরুদার মৃত্যু দেখতে। আমি
স্পেন গিয়েছিলাম লোরকার মৃত্যু দেখতে
তিনটে বুলেট তাঁর কোমরের তলা দিয়ে ঢুকে
কিভাবে বেরিয়ে এসেছিল –
কিন্তু বুলেট কিছুই করতে পারেনি কবিতার।
এখনও স্পেনের আকাশ ভরে যে জ্যোৎস্না ওঠে
তার নাম ফেদরিকো গার্সিয়া লোরকা।

আমি ঠিক এটাই বলতে চাইছিলাম
পৃথিবীর যেখানে যেখানে আজও বৃষ্টি হয়
তার নাম বাইশে শ্রাবণ।

আপনার খুব কষ্ট হচ্ছিল সেদিন
দুপুর থেকে বিকেল থেকে সন্ধ্যা থেকে
আপনার ঘনঘন হিক্কা উঠছিল
হিক্কা হিক্কা শুধু হিক্কা
যেন সভ্যতার সংকট হিক্কা হয়ে
আপনার গলা বেয়ে উঠে আসছিল নাকে মুখে।
ময়ূরের পালক পুড়িয়ে আপনাকে খাওয়ানো হল
জানি না আপনি খেয়েছিলেন কিনা
আপনি তখন খাওয়া-না-খাওয়ার উর্ধে
রাত তিনটের সময় আপনি চোখ মেলে তাকালেন
আপনি বারান্দায় এলেন
কোথায় দারোয়ান তার পেটে ব্যথা করছিল কাল
সে কোথায় আমি তাকে ওষুধ দেব।
বাবামশাই, আপনি ঘুমোন, দারোয়ান ভাল আছে।
অন্ধকারের ভেতর যে আশ্চর্য আলো থাকে
সেই আলোতে বসেছিল
একটা চড়ুই, আপনি চড়ুইয়ের সামনে বসে পড়লেন
জোড়াসাঁকোর দোতলায় সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য
আপনি দুচোখ ভরে দেখছেন একটা পাখিকে
পাখিও দুচোখ ভরে দেখছে আপনাকে
আপনি বললেন, তুই আমাকে নিতে এসেছিস ?

পরের পরের দিন। মধ্যাহ্নের এক মুহূর্ত আগে।
আপনার ডান হাত উঠে গেল শূন্যে
তারপর নেমে এল নাকে তারপর চোখে
আপনার রোগা হয়ে যাওয়া দুটো আঙুল
তিরতির করে কাঁপছিল। একটা আঙুল জন্ম
একটা আঙুল মৃত্যু তারা দুজনে গাইছে:
‘তোমার কাছে এ বর মাগি মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে’।
ঠিক তখনি খসে পড়ল আপনার হাত
বিছানার গা বেয়ে খসে পড়ল
ঝুলতে লাগল মেঝের একটু ওপরে।

আমি আজ বাইশে শ্রাবণ।
আমি পাবলো নেরুদার মৃত্যু দেখেছি
লোরকার মৃত্যু দেখেছি
কিন্তু কোনও কবিকে মৃত্যুদিনে জন্মাতে দেখিনি।
কয়েক কোটি মানুষ চোখের জল মুছতে মুছতে
রাজপথে নেমে এসেছিল
প্রতিটি চোখের জল গীতবিতান।
চড়ুই, তুই কাকে নিতে এসেছিলি ?

পৃথিবীর যেখানে যেখানে আজও বৃষ্টি হয়
তার নাম বাইশে শ্রাবণ।

রবীন্দ্র সংকলন "প্রভু আমার" ২০২৩-এ প্রকাশিত

তাকেই দিতে চাই

শ্রীজাত

এমন দিনকালে তুমিই বুঝিয়েছ
লেখার চোখ আর গানের মন
শিখেছি এতদিনে তোমার কাছ থেকে
তীব্র চাওয়া মানে সমর্পণ।

একটু পেতে হলে অনেক দিতে হয়
যতটা দিতে চাওয়া সময় চায়
জীবনে দেখা হওয়া অল্প, তাও ভাল
শান্ত থাকি যেন অপেক্ষায়।

আমারও দিন যায় বড়ই অগোছালো
নিজেকে কুড়িয়েছি বিকেলভর
যুদ্ধ শেষ করে বুঝতে পারি আজ,
আমারই পৃথিবীতে তোমার ঘর।

যে ছিল বহূ দূরে, যে ছিল ভারী কাছে
যে কাছে থেকে যায় অনেক দূর ...
তাকেই দিতে চাই, যা কিছু পাওয়া ছিল।

সে আর কেউ নয়। রবি ঠাকুর।

ব্রুটাস

তন্ময় চক্রবর্তী

'The greatest enemy will hide in the last place you would ever look.'
— Gias Julius Caesar

মার্চ মাসের সেই ষড়যন্ত্রের নথি ঘেঁটে বোঝা গেল
গুপ্তঘাতকেরা কখনও প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ করেনি।
কিন্তু তথ্য প্রমাণ বলছে
তারা লুকিয়ে একে অন্যের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

এবার আসা যাক ষড়যন্ত্রের ছকের কথায় ...
এক সেনেটর ফিসফিস করে বলল,
সম্রাট প্রতিদিন যে পথ দিয়ে যাতায়াত করেন
ও পথেই ওকে না হয় ...
কেউ একজন বাধা দিল।
গলার স্বর আরও নামিয়ে বলল
উঁহু, সঠিক সময় সন্ধ্যেবেলা।
যখন উনি ঠিক সেতুর উপর দিয়ে যাবেন
যদি ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া যায়।
তারপর সেতুর নীচে কুপিয়ে ...।
একজন মুচকি হেসে বলল,
হ্যাঁ, তোমার যা বুদ্ধি,
সে সময় সম্রাটের দেহরক্ষীরা কি হাওয়া খেতে যাবে ?
মশালের নিভু আলোতেও ষড়যন্ত্রের তাপ।
কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে ছিল
একজন হঠাৎ বলে উঠল,
ধুসস, এমন একটা ভালো দিন খুঁজে বের করো যে, কেউ সন্দেহ করবে না।
ভাবুন একবার। খুন, তাতেও ভালো দিন ?

এর পর গাঢ় রাত্রি নেমে এলে
তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত হল, হত্যা হবে সেনেট হলেই
ছোরাগুলো লুকিয়ে আনতে হবে কাপড়ের ভাঁজে।

পাথরের দেওয়ালের আড়াল থেকে
কেউ একজন কথাগুলো শুনেছিল।

কণ্ঠস্বর চেনা মনে হলেও, অন্ধকারে কারো মুখ সে দেখতে পায়নি।
তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরে এসে সে ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।
এ কথা কাউকে জানাতে সাহস করল না।

এতক্ষণ, আমার যে রাজনৈতিক বন্ধু গল্পটা শুনছিল
সে আপনমনে একটু হেসে সিগারেট ধরিয়ে বলল, বলে যা।
আমি রসিকতা করতেই
বন্ধু তিতিবিরক্ত। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল
তোকে শেক্সপিয়র আওড়াতে বলিনি
কন্সপিরেসিটা শেষ কর। দরকার আছে।
স্পষ্ট দেখলাম ওর চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়া।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ও শুরু করল
আগের দিন রাত্রে খুব ঝড় বৃষ্টি ছিল, তাই না রে ?
ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, হয়ত তাই।
আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যায় সম্রাট-পত্নীর।
চিৎকার করে উঠেছিলেন, গার্ড, গার্ড
হয়ত ভয় পেয়েছিলেন।
অ্যাশট্রেতে জ্বলন্ত সিগারেট গুঁজে বন্ধু জোর গলায় বলে উঠল
উনি ভাবতেও পারেননি যে, বন্ধুরা মহান সম্রাটকে খুন করবে।
আমি ওকে থামিয়ে ইতিহাসের হলুদ পাতা খুললাম।
বন্ধু জিজ্ঞেস করল,
এত বারণ সত্ত্বেও তো মহান সম্রাট সেনেট গেলেন
আর তার পরই ...

বইয়ের পাতায় থমকে আছে ইতিহাস।
ষড়যন্ত্রকারীরাও ভয় পেয়েছিল
তারাও জানত, ষড়যন্ত্র একবার প্রকাশ পেলে
কাউকে আর জীবন্ত বাড়ি ফিরতে হবেনা।
সেদিন সকালে, কেউ হয়ত খেয়াল করেনি
রাজপথে থামের আড়ালে
একটা ময়লা কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল এক আগন্তুক।
তাতে হয়ত লেখা ছিল ...
প্রিয় সিজার, ব্রুটাস সম্পর্কে সাবধান
কাসকাকে একটু দূরে রাখাই ভালো
ক্যাসিয়াস ? তাকেও কি পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়।
এরা কেউ কি তোমার বন্ধু ?
অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, কখনও কখনও বিপদ ডেকে আনে
নিঃশব্দে খুলে দেয় হত্যার দরজা।

বন্ধুর ম্লান হেসে স্বগতোক্তি করল
ভাগ্য আর চক্রান্তকারীরা যখন একসঙ্গে বিরুদ্ধে যায়
তখন আর কিছুই করার থাকে না ।

বাকি গল্প প্রায় সকলের জানা ।
এর কিছুক্ষণ বাদেই খুন হন জুলিয়াস ।
ইতিহাসও আশ্চর্যজনক । সেই বিপরীত সূত্রের মত ।
কাউকেই খুব একটা ক্ষমা করে না ।
একে একে সব বিশ্বাসঘাতক ও চক্রান্তকারীরও মৃত্যু হয় ।

বন্ধুর হাতে আবারও সিগারেট
টেবিলের ধোঁয়া ওঠা কালো চায়ের ওপর
বর্ষার আকাশ । ঘন মেঘে ঢাকা ।
বাড়ির নীচে সরু গলি । হত্যার প্রতিবাদে দীর্ঘ মিছিল ।
হঠাৎ করেই দরজা খুলে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে
বন্ধু মিলিয়ে গেল মিছিলের ভিড়ে ।

নতুন ভোর (জানুয়ারী ২০২৪)-শে প্রকাশিত

মৃত্যুহীন মেয়ে

তসলিমা নাসরিন

ত্রিপোলির যে মেয়েটি বোরখা পরেনি বলে রাস্তায় মার খেলো
সে আমি,

ঢাকার যে মেয়েটি জার্সি পরে ফুটবল খেলেছে বলে হেনস্থা হলো,
সে আমি,

রিয়াদের যে মেয়েটি দেশের বাইরে একা যেতে চেয়েছিল বলে জেলে গেল,
সে আমি,

কাবুলের যে মেয়েটিকে প্রেম করার অপরাধে পাথর ছুঁড়ে মারা হলো
সে আমি।

দামেস্কের যে মেয়েটিকে পিটিয়ে হত্যা করলো তার স্বামী
সে আমি,

কায়রোর যে মেয়েটি বিয়েতে রাজি হয়নি বলে খুন হলো,
সে আমি,

মগাদিশুর যে মেয়েটি শান্তির জন্য পথে নেমেছিল বলে খুন হলো,
সে আমি,

তেহরানের যে মেয়েটি হিজাব পরেনি বলে খুন হলো
সে আমি।

ফেলুদার খোঁজে

ইন্দিরা চন্দ

টেলিফোন টা উঠলো বেজে
ওপাশে ফেলুদা র গলা
'তপসে ready থাকবি বিকেলবেলা
দেখা হবে, ছদ্মবেশে দাড়ি গোঁফ, আর ঝোলা'

টেলিফোন টা গেল কেটে
তপসে বলে, কোথায় যাবো ? গন্তব্য কোনদিকে ?
'কুছ পরওয়া নেহি!' লালমোহন বাবু বলেন হেঁকে
'ফেলুবাবু যখন বলেছেন দেখো না ধৈর্য্য রেখে'

ঠিক পাঁচটায় দুবার বাজলো হর্ণ
'তপসে উঠে এসো গাড়িতে'
পরচুলা আর দাড়িতে
লালমোহন বাবু বললেন 'বম্ কালী'
আওড়াতে আওড়াতে ...

গাড়ি ছুটলো টালা র এক পুরোনো বাড়ির দিকে
একচিলতে ছাদের পাশে সংসার এক কামরায়
এক দিকে রেলগাড়ির স্বপ্ন অন্য দিকে ছেঁড়া পর্দা ওড়ে জানলায়
ফেলুদা তিনি নাকি এখানে অপূর্ব কুমার রায় !

'প্রদোষ মিত্রই কি অপূর্ব রায়! Highly suspicious! ব্যাপারটা কি বুঝলে হে তপসে ?'
'গুলিয়ে যাচ্ছে লালমোহন বাবু' তপসে বলে চিন্তায় চোখ বুজে
গাড়ি চলে কলকাতা ছাড়িয়ে গ্রাম বাংলার সবুজে
ফেলুদার ছবি দেখিয়ে পৌঁছায় ওরা কালীকিংকর চৌধুরীর দালান কোঠায় অনেক খুঁজে খুঁজে

একি এ যে একেবারে অন্য রূপ, স্বপ্ন চোখে, মন উন্মুখ
'উমাপ্রসাদ, দয়াময়ীর স্বামী, ব্যাচেলর ক্লাবের এমন পরিণতি আশা করিনি আমি'
হতাশ লালমোহন বাবু বলে ওঠেন নৌকা যখন উজান গামী
কাদা মাখা শহুরে অমূল্যর সাথে মৃন্ময়ীর দেখা, এ দৃশ্য বড়ই দামি

'নাহ, এখানেও ফেলুদাকে গেল না পাওয়া,' তপসে বলে ওঠে
'Do not worry Tapas babu what we are following
Leads to the Rajput driver whose name was Narsingh
সেই অভিযানে সামিল হলেই ব্যাস every thing matching!!'

'ফেরা যাক কলকাতা তবে, কি বলেন লালমোহন বাবু ?'
এখানে যখন পেলাম না তাঁর দেখা
হয়ত, সেই রোমান্টিক অমল বা কাপুরুষ অমিতাভ কলকাতার রাস্তায় ঘুরছে একা একা
'চল, ফিরে যাই', লালমোহন বাবুর গলায় বিষাদ মাখা

এর পর উঠে আসে আরো কত নাম কত ছবি, কত পরিচয়
পালামৌর জঙ্গলে যে যুবক অসীম, সেই আবার কালের কাছে পরাজিত গঙ্গাচরণ
কখনও সন্দীপের মতো উদ্দাম প্রাণবন্ত অথবা তার উদয়ন পন্ডিতের মতো বিদ্রোহী মন
আরো আছে সেই স্বচ্ছমনা প্রশান্ত আর ডাক্তার গুপ্ত যে সৎ এবং সমাজ সচেতন।

তাহলে ফেলু মিত্তির গেলো কোথায় ? তপসে, লালমোহন বাবু বসে বসে ভাবে
উটের পিঠে চড়ে মরুভূমির বালি মেখে মুকুলের সাথে তবে কি সোনার কেল্লায় ?
নাকি সেখান থেকে বেনারসের অলি গলি, ঘুরে ক্যাপ্টেন স্পার্কের ডেরায়
ঐ যে লালমোহন বাবু দেখুন, বলে তপসে,
ফেলুদা মছলিবাবার ছদ্মবেশে মগজাস্ত্র দিয়ে মগনলালের আঁশ ছাড়ায়।

এই জীবনে যদি আরো একবার

অমর মিত্র

আমার ছেলেবেলার কলকাতা ছিল অতি শান্ত। বাড়ির উল্টোদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোরখা রেজিমেন্ট ক্যাম্প ছিল। ইগলুর মতো ঘর। আমরা বলতাম নেপালি ক্যাম্প। সেই ক্যাম্প ধীরে ধীরে উঠে গেল। আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ির চিলেকোঠার ঘরে একটি নেপালি পরিবার বাস করত। পরিবারের কর্তা সেপাই ছিলেন। তাদের ছেলেটি আমার বয়সী। একদিন তারাও চলে গেল দেশে। দেশ দারজিলিং জেলা হতে পারে, সিকিম হতে পারে, নেপালও। সেই কলকাতায় ছিল লাল দোতলা বাস। আমাদের এই অঞ্চল থেকে সেই লাল দোতলা বাস ২ নম্বর আর ৩৩ নম্বর ছাড়ত। কবছর আগেও ছাড়ত, এখন আর ছাড়ে না। উঠেই গেছে হয়তো। আমার মনে পড়ে ৩৩ নম্বর বাসের দোতলায় চেপে আমি চলেছি একেবারে চেতলা। ছোটমামা থাকতেন সেখানে। মা ভাল কিছু রাঁধলে টিফিন কেরিয়ারে ভরে দিতেন। আমি মহা আনন্দে বাসের দোতলায় বসে কলকাতা দেখতে দেখতে চলেছি চেতলা। অনেক পরে বেলগাছিয়ায় ২ নম্বর বাসে চেপে বালিগঞ্জ স্টেশন পযর্ন্ত গিয়ে যাত্রা শেষ করেছি। স্টেশন রোডে মহাশ্বেতাদি থাকেন। তাঁর কাছে নতুন লেখা নিয়ে আমার নিত্য ছিল যাওয়া। আর ছিল তাঁর নতুন গল্প স্বকর্ণে শোনা। ২ নম্বর বাসে করে, রাসবিহারী মোড়ে নেমে ২২/বি প্রতাপাদিত্য রোডেও গেছি জেলা থেকে কলকাতায় ফিরেই। সাহিত্যের আড্ডা পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের ঘরে, পরে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি। কলকাতায় দোতলা বাস বলতে আছে একটি-দুটি এল-৯। আগে কত রুট ছিল। খালপাড় থেকে ৩ নং বাস যেত খিদিরপুর। তাতে চেপে আমরা গেছি চিড়িয়াখানায়। ৫ এবং ৬ নং রুট ছিল গড়িয়া থেকে হাওড়া। একটি নাকতলা হয়ে, অন্যটি বাঘাযতীন যাদবপুর হয়ে। বালিগঞ্জ হাওড়া যেত ১০ নং বাস। ৮-বি ছাড়ত যাদবপুর থেকে। যেত হাওড়া অবধি। বাস টারমিনাসের নাম আছে টিকে, কিন্তু দোতলা বাস নেই। অশোক লেল্যান্ড কোম্পানির সেই সব লাল দোতলা বাস আমি দেখলাম বহু বছর বাদে ঢাকায় গিয়ে। স্বকৃত নোমান এবং আমি লাল দোতলায় চেপে ফার্ম গেট অবধি গেলাম নাকি কোন অব্ধি গেলাম। আমি দোতলার ছবি তুললাম। তখন স্বকৃত কাজ করত এই সময় পত্রিকায়। কলকাতার সৌন্দর্য হানি হয়েছে লাল দোতলা বাস তুলে দিয়ে। এই বাসের দোতলার সামনের সিটে বসে প্রেমিক প্রেমিকারা গল্প করতে করতে বালিগঞ্জ কিংবা চেতলা চলে যেত। আবার ফিরত। কী সুন্দর ছিল সেই যাওয়া। কী সুন্দর ছিল সেই আসা।

যখন আমি উত্তর থেকে দক্ষিণে আড্ডা মারতে গেছি রবিবার, তখন আমি মেদিনীপুর জেলায় চাকরি করি। কলকাতায় ফিরে আড্ডা হতো। আমি ছিলাম নানা জায়গায়। ঝাড়্গ্রাম মহকুমার কুলটিকরি, বেলিয়াবেড়া, গোপীবল্লভপুরের ভিতরে বংশীধরপুর নামের এক গ্রামে। অমর্দা-বংশীধরপুর ছিল গোপীবল্লভপুরের এক দূর অঞ্চল। খড়্গপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে গোলবাজারে গিয়ে সিং কোম্পানির বাস। সেই বাস কলকাতার বাবুঘাট থেকে ওড়িশার বারিপদা অবধি যেত। আমি তাকে ধরতাম খড়্গপুরে। সিং কোম্পানির বাস ঘন্টা তিন থেকে সাড়ে তিন নিত ৬ নং জাতীয় মহাসড়ক ধরে বহড়াগোড়া হয়ে জামশোলা ব্রিজে পৌঁছতে। সেখানে বাংলা বিহার ওড়িশা মিলেছিল এক জায়গায়। বিহারের সিংভূম জেলা (এখন ঝাড়খন্ডের), ওড়িশার ময়ুরভঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা (তখন অখন্ড, এখন পশ্চিম মেদিনীপুর) জামশোলায় মিলেছে। সেখানেই ঝাড়খন্ড থেকে এসে সুবর্ণরেখা নদী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। নদীর দুই তীর প্রস্তরাকীর্ণ। সেখান থেকে জঙ্গলে প্রবেশ করে আমার ক্যাম্প অফিসের দিকে এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটা। থাক এই কথা এখন। পরে হবে। আবার ছেলেবেলার কলকাতায় ফিরি।

ছেলেবেলার কলকাতায় লাল পাগড়ি পুলিশ ছিল অনেকদিন অবধি। তা ছিল ব্রিটিশ শাসনের পরম্পরা। লাল পাগড়ি ছিল ইংল্যান্ডের রাজার শাসনের শেষ চিহ্ন। স্বাধীন দেশে তা লুপ্ত হল, বেশ হল। কবে হল তা, মনে নেই। তখন

কলকাতা শহরের ভিতর প্রাইভেট বাস ঢুকতে পারত না। ট্রাম চলত দ্রুত গতিতে ঠং ঠং করতে। আমাদের তিনঘরের ফ্ল্যাটে তখন কত লোক। বাইরের লোক বেশি। মামারা ছিলেন কিছুদিন। সে ছিল আনন্দের দিন। মামাত দিদি বোন, খুড়তুতো দিদি বোনদের সঙ্গে বড় হওয়া। তা ছাড়া ছিল, মেজকাকার বন্ধু ফনীবাবু, দন্ডীরহাটের লোক, পূর্ববঙ্গের লোক। প্যাসেজ রান্না ঘরে পযর্ন্ত বিছানা পড়ত। আমাদের বাসা ছিল বহুজনের আশ্রয়। ওপার থেকে উচ্ছিন্ন মানুষ তারা, যাবে কোথায় ? বাড়িতে তেমন জায়গা নেই তাই বাইরে ঘুরি। খেলার মাঠে ফুটবল পেটাই। সারাদুপুর ক্রিকেট। সন্ধের আগে কিং কিং, পিট্টু। কেমন একটা বড় হওয়া বুঝিবা। আর এর ভিতরে এক একটা দিন যেন আসত রূপকথা হয়ে। টালা পার্কে চুনী গোস্বামী ক্রিকেট খেলতে এসেছেন মোহনবাগানের হয়ে। শ্যামসুন্দর মিত্র, দুর্গাশঙ্কর মুখার্জী এসেছেন। ঘূর্ণি বল দেখছি সমর নাথের। তিনি এই পাড়ারই বাসিন্দা, বেঙ্গল টিমের খেলোয়াড়। এরাই হলেন বালকের রূপকথার রাজপুত্র। তখন ছেলেবেলা কাটত ক্রিকেট ফুটবল নিয়ে। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান নিয়ে। তারপর বালক দেখেছিল এই জায়গার বড় মানুষদের। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্রদের।

এই অঞ্চল এখানকার ক্লাব, বেলগাছিয়া ইউনাইটেড ক্লাব নিয়ে সব সময় খেলাধুলোয় সোরগোল বাঁধিয়ে রাখত। আমি সকালে দাঁড়িয়ে আছি ফুটপথে, দেখছি জাকার্তায় এশিয়ান গেমস জয়ী ভারতীয় ফুটবল দলের প্রশান্ত সিংহ আসছেন বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে। তিনি কাছের রেল কোয়ার্টারে থাকতেন। কী বিস্ময় আমার চোখে। সুধীর আর সুশীল কর্মকার দুই ভাই এই অঞ্চল থেকে বড় মাঠে গিয়েছিলেন। পরে তাঁদের ছোটভাই শ্যামও। আমার মনে পড়ে সেলিম, আনোয়ার দুই ফুটবলারের কথা। কী অপরূপ ছিল তাদের পায়ের কাজ ! তারা থাকত বেলগাছিয়া মুসলমান বস্তীতে। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম তারা বড় কোথাও যাবে। বেঙ্গল খেলবে, ইন্ডিয়া খেলবে। তা হয় নি। তারা কোথাও যায় নি। হারিয়ে গেল। শুনেছি দারিদ্রের কারণে খেপ (ভাড়াটে) খেলে খেলেই শেষ। আমার পাশের বাড়ির কল্যান মুখার্জী আমারই বয়সী। সে ছিল পরম প্রতিভাবান ফুটবলার। কুমার আশুতোষ ইন্সটিটিউশন সর্ব ভারতীয় স্কুল ফুটবল সুব্রত কাপ জিতল, সে ছিল সেই দলের অধিনায়ক। ক্রিকেট খেলতও ভাল। কিন্তু সে বেশিদূর যেতে পারে নি। কেন তা আমি জানি না। রূপবান ছিল সেই কিশোর সেই বালক সেই যুবক। অকালে তার প্রয়াণ ঘটেছে। তার জন্য আমার মন খুব খারাপ হয় মাঝে মাঝে। এখানে ওখানে প্রকাশিত লেখা পড়ে সে কখনো-সখনো বলত।

একটি বালক তখন বড় হয়ে উঠত ফুটবল আর ক্রিকেট হকি নিয়ে। এত বড় মাঠ এখানে। ওই মাঠে ছুটতে ছুটতে সবার শেষে পৌঁছেও বারে বারে আমি নাম দিয়েছি ১০০ মিটার ২০০ মিটার দৌড়ে। নো মেডেল নো কাপ, তবু না দৌড়লে না ছুটলে বড় হতাম কী করে ?

এপাড়াতেই থাকতেন ক্রিকেটার সুশীল বসু। তিনি বাংলা দলে খেলেছেন শুনেছি। তাঁর পুত্র প্রদীপ বসু ভাল খেলতেন। টালা পার্কে তাঁর সেঞ্চুরি দেখেছি। যা মনে মনে ভাবতাম সেই জায়গায় তিনিও যান নি। জীবন মানুষকে নিয়ে কী করে তা জানবে কে ? তাঁর ভাই প্রবাল আমার সহপাঠী। সে ছিল ভাল শিল্পী, ভাস্কর। সে এখন মার্কিন দেশের নাগরিক। তার জীবন আলাদা হয়ে গেছে। এক ক্রিকেটার, পেস বল করতেন। বেলগাছিয়া ইউনাইটেড ক্লাব সি এ বি নক আউট ফাইনাল খেলছে। তাঁর বড় ভূমিকা। সেদিন দেখলাম মুদির দোকানে এসে ২৫০ গ্রাম সর্ষের তেল কিনতে দাঁড়িয়ে আছেন। খেলা তাঁকে কিছুই দেয়নি। ভালো চাকরিও না। আমার সহপাঠী হিরন্ময় দাস ছিল প্রতিভাবান স্পিনার। হারিয়ে গেল বন্ধুদের সঙ্গে সেই অলীক বিপ্লবের দিনে। কোথায় আছে কে জানে ? আছেই কি না কে জানে? মনে হয় বেঁচে নেই।

এখন খন্ডে খন্ডে ভাগ হয়ে গেছে টালাপার্ক। ছেলেবেলায় তা এক ছিল। ইন্দ্র বিশ্বাস রোড ধরে টানা চলে গিয়েছিল সেই মাঠ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি পযর্ন্ত। আমি দেখেছি ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের পশ্চিমে বাঙলো বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা লোমে ভরা আদুরে কুকুর সঙ্গী মেমসায়েবকে। তার পাশে সাহেব শিশু, বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছেন। সেই বাংলো বাড়িটি পরে চিত্র পরিচালক নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়দের অধিকারে যায়। তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি সেই

বাংলোটিতেই। নব্যেন্দুদাকে আমার স্মৃতি বলতে তিনি অবাক। জানতেন না আমার ছেলেবেলায় প্রথম দেখা বিদেশিনীর আস্তানাটিতে তাঁরা রয়েছেন। এখন সেই বাংলো নেই। ভেঙে বহুতল। নব্যেন্দুদা নেই। ভেঙে বহুতল উঠেছে। ঐদিকে আর যেতেই ইচ্ছে করে না। কতদিকেই না যেতে ভাল লাগে না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িটি শূন্যপুরী। এখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কিনে নিয়ে বহুতল গড়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে। বাড়ির গায়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বোর্ড লেগে গেছে। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি বলে চেনা যায় না। বোর্ডে তাঁর কোনো উল্লেখ নেই। জয়শ্রী ভবন নামে চিহ্নিত হয়েছে বাড়িটি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে আমাদের মধুর সম্পর্ক ছিল। এক পৌত্র অমলশঙ্কর থাকতেন এই বাড়িতে। তিনি এখন কাছেই একটি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হয়েছেন। জেষ্ঠ পৌত্র হিমাদ্রিদা নেই এখানে। হিমাদ্রিশঙ্কর গুনী ইতিহাসবিদ। তাঁর সাহায্য পেয়েছি আমি প্রাচীন ভারত নিয়ে আমার উপন্যাস ধ্রুবপুত্র লিখতে গিয়ে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িটিকে আমার দেবমন্দির মনে হতো। এখন এমন এক নিস্তব্ধপুরী হয়ে গেছে তা। তাঁর জন্মদিন গেল অগোচরে। তাঁর সমস্ত স্মৃতি জমা পড়ে গেছে বাংলা একাডেমিতে। আমার মনে পড়ে ১৯৭১-এ তাঁর মৃত্যুর দিনে যত সময় না শব যাত্রা শুরু হয়, দাঁড়িয়ে ছিলাম বাড়িটির সামনে। একে একে বিখ্যাত মানুষ আসছেন, প্রণাম করে যাচ্ছেন। এলেন পূর্ণ দাস বাউল। তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে গান গাইলেন। সেই শোক মিছিলের ধারা বিবরণী রেডিওতে শুনেছিলাম বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে। আমার বিনীত নিবেদন বাড়িটিতে তিনি যেন স্বমহিমায় থাকেন। বাড়িতে তাঁর স্মৃতি যেন সঞ্চিত থাকে। ১৯৭১-এর ১৪-ই সেপ্টেম্বর তাঁর প্রয়াণ। সেই বছর পয়লা বৈশাখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আমাদের পাড়ার ত্রিকোন পার্কে একটি সভা করেছিলাম। সেই আয়োজনের মূল পান্ডা ছিলাম আমি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক অসামান্য বক্তৃতা দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে। শহীদ বেদীর প্রস্তর লিখন ছিল তাঁর। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি পাড়া থেকে চাঁদা তুলেছিলাম, সেই টাকায় প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম কিনে কয়েকজনের সঙ্গে বনগাঁ গিয়ে ঘুর পথে সীমান্ত পার হয়ে চলে গিয়েছিলাম এক মুক্তি শিবিরে। আমার সঙ্গী ছিল তথাকথিত বস্তিবাসী যুবক কয়েকজন। তারা সঙ্গে ছিল। দালান-কোঠার কেউ যায়নি। সমর্থন ও করেনি।

এই ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, মন্মথ দত্ত রোড, খেলাৎ বাবু লেন, একটু দূরে রাজা মনীন্দ্র রোড, হর্ষমুখী রোড নিয়ে আমার ছেলেবালার সেই সব এলাকা প্রায় সেই রকম আছে। আমার বাল্যকাল, তারও আগের সেই রামায়ণ মহাভারতের যুগে। শুধু কয়েকটা বাড়ি ভেঙে বহুতল উঠে স্মৃতি কেঁপে গেছে। ঝিল পুকুরের গাছগাছালি ভরা দ্বীপটিকে বিলাসের জায়গা বানাতে গিয়ে গাছ কেটে অজস্র বকের বাসা ভেঙে তাদের নিরাশ্রয় করা আর পুকুরের পাড় বাঁধান ব্যতীত সব আগের মতো আছে। পাড় বাঁধিয়ে জৈব বৈচিত্রে আঘাত করা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে জীব জগতের অন্য প্রাণীদেরও এই পৃথিবীতে সমান অধিকার সেই কথাটা আমরা ভুলে যাই। কিন্তু পুকুর ঘিরে গাছেরা আছে। তা আগে ছিল না। উন্নয়ন সুন্দর করে, অসুন্দরও। আমাদের এই এলাকা যত পরিচ্ছন্ন তা কি কলকাতার অন্য কোথাও দেখি ? কী সুন্দর বর্ষায় ধোয়া রাস্তা। জুঁই আর কদম ফুলের গন্ধে বাতাস ভারি। টালা পার্ক সবুজে সবুজ। আমি দেখতে পাই আমাকে। ওই যে আমি সবুজ মাঠে ছুটছি। হাফ প্যান্টের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা টিংটিঙে পা দুটো চাইছে সবার আগে যেতে। রয়েছে সে সবার পিছনে। হুইসল বাজিয়ে দিচ্ছেন পান্না স্যার। আমাদের ড্রিল মাস্টার মশায়। এই তো আমি দেখছি তা মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে।

ছেলেবেলায় যারা বন্ধু ছিল তারা বেশিরভাগ সরে গেছে জীবন অন্য খাতে প্রবাহিত হওয়ায়। তবে বই পড়া নিয়ে দুই বন্ধুর কথা খুব মনে পড়ে। একজন দিলীপ পালিত। অন্যজন যে তার নাম গোবিন্দ মনে হয়। তারা খুব বই পড়ত। দিলীপ পালিত থাকে ভিলাই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অসম্ভব অনুরাগী। আর গোবিন্দ খুব সামান্য চাকরি করা এক দুমড়ে যাওয়া মানুষ। এই জীবন আরো একবার যদি শুরু করা যেত, দুমড়ে যাওয়া গোবিন্দকে ভালো ভালো বই দিতাম উপহার। সুকুমার রায় থেকে ম্যাক্সিম গোরকি, ভিক্তর উগো, রবার্ট লুই স্টিভেনশন, চার্লস ডিকেন্স, এই সব অনুবাদ পড়ে পড়েই তো বড় হওয়া। বইয়েই গোবিন্দ তার মুক্তি খুঁজে নিত।

সংকলন ২০২০-তে প্রকাশিত

কোঁকোঁর কোঁ

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০১৬ সালের ২৮ আগস্ট, বেজিং

দুদিন হল এসে পৌঁছেছি এই সুবিস্তীর্ণ শহরে। এবং এসে থেকে আক্ষরিক অর্থেই খাবি খাচ্ছি। নিজেরাই নিজেদের মুণ্ডপাত করছি, কেন যে বেজিং ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ারের চিঠি পেয়ে নাচতে নাচতে এলাম! খাবি ছাড়া আর কিছুই জুটছে না! সঙ্গে বুদ্ধি করে কিছু চিড়ে ভাজা, বিস্কুট, ম্যাগি এনেছিলুম, তাই এখনও বেঁচে আছি। কেউ একবর্ণ ইংরেজি বুঝতেই চাইছে না। রেস্তোঁরার মেনু কার্ডে ছবি দেখে নুডলস অর্ডার দিয়েছি তো এনে হাজির করছে দুষ্পাচ্য এক ঘ্যাঁট। মুখে দিলে আমার শুধু নয়, পূর্বপুরুষদের অন্নপ্রাশনের ভাত অব্দি বেরিয়ে আসছে।

লোকজনও তেমনি। ভাষা ছেড়ে দিন, বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝানোর চেষ্টা করলে আরেক বিপত্তি। হাত পা নাড়লেই সন্দেহের চোখে তাকায়। এই যেমন, কাল সকালে। আমাদের সানলিটান হোটেল থেকে ডিরেকশন নিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিকটবর্তী মেট্রো স্টেশন ডংজিমেন পৌঁছেছি। এখান থেকে কী করে যাব ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার? যাকেই শুধোই, সে আমাদের আগাপাশতলা মাপতে মাপতে ঘাড় নাড়ে।

মেট্রোর বাইরে এক তরুণকে পেয়ে গেছি। শুনেছি, নতুন প্রজন্ম ইংরেজি একটু জানে। হাতে আবার দামি আইফোন। কর্ড কানে গোঁজা। তাকে আমার সঙ্গী মিলিন্দ বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। জিজ্ঞাস্য একটাই – কোন স্টেশনে নামতে হবে?

সে ভ্যাবলার মতো মুখে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হাতের মোবাইলটা আমাদের দেখাল। নাহ্‌, গুগল মামা ওদেশে নেই। বিং নামের অন্য একটা সার্চ ইঞ্জিন, যা ভিনদেশিদের জন্য নয়। শেষে মিলিন্দ এক বুদ্ধি বের করল। ছেলেটার মোবাইলে ইংরেজি অপশনে গিয়ে আমাদের গন্তব্য টাইপ করে দিল। ছেলেটা সেটা চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করে ঘাড় নাড়ল।

একটুক্ষণ খুটখাট করে সে আমাদের দিকে এগিয়ে দিল। বাঃ! পেয়েছে। আমাদের যুদ্ধজয়ের আনন্দ। মিলিন্দ দারুণ উত্তেজিত, বুঝলেন! দিস ইস দ্য ওয়ে। এই দেখুন, অলিম্পিক স্পোর্টস সেন্টার স্টেশন। ওখানেই নামতে হবে।

হোঁচট খেতে খেতে শেষ অব্দি পৌঁছে গেলাম বইমেলা। আর সেখানে গিয়ে আমরা খুশিতে ডগমগ। দিল্লি থেকে জনা তিনেক ভারতীয় বন্ধু প্রকাশক গেছে। তাদের সঙ্গে তুমুল আড্ডা। তারা নিয়মিত চিন যায়, তাদের বইটই চিন থেকে ছাপে, এমনকী তাদের জয়েন্ট বিজনেসও আছে চৈনিক প্রকাশকের সঙ্গে। ওদের সঙ্গে চিনা মানুষজন আছেন, তারা দিব্যি ইংরেজি বলতে পারেন। মরুভূমির মধ্যে একটুকরো মরুদ্যান! আহা, কী আনন্দ।

বইমেলার কফি শপে বসে তখনই ঠিক হয়ে গেল, বেইজিং পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন আমাদের সম্মানে সেইদিনই ডিনার হোস্ট করবেন। এ যে মেঘ না চাইতে জল। রাতে অখাদ্য গিলতে হবে না। তবু ভদ্রতা করে বললুম, এ হে হে, আজকেই এসব কী দরকার? হবে এখন।

ওরা নাছোড়বান্দা। তখন কি আর জানতাম, কপালে দুর্ভোগ নাচছে!

সন্ধের পর মেলা থেকেই সেভেন স্টার হোটেল, ওদের গাড়িতে। গিয়ে চোখ ছানাবড়া। ব্যাঙ্কোয়েট হলে এলাহি আয়োজন। ডিম্বাকৃতি বিশাল সেন্টার টেবিলে অসংখ্য খাদ্য ও পানীয়। অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন কর্তাও এসে গেলেন। কথাবার্তা শুরু হল। আমাদের পেটে ছুঁচো ডন দিচ্ছে, বারবার নজর চলে যাচ্ছে নানাবিধ পদের দিকে।

গম্ভীর আলোচনা শেষ। এবার ডিনার শুরু। আইটেমের মধ্যে আছে চেনা লবস্টার, চিকেন কিম্বা ব্যাঙের লেগপিস, নুডলস, বড় সিদ্ধ স্যামন, দু তিনরকম অচেনা মাংস ও দাঁড়াওয়ালা জীব। পানীয় অধিকাংশ স্কচ, রাম এবং সাদাটে একপ্রকার তরল। পাশের দিল্লির বন্ধুকে জিগ্যেস করতে সে বলল, ওর নাম মাওতাই, দিশি পানীয়।

খাদ্য বাড়িয়ে দিতেই যথাসম্ভব গোগ্রাসে খাওয়া শুরু করেছি। হঠাৎ ওদের সভাপতি বলে উঠলেন, নো নো। প্রথমে আমাদের ড্রিংক, আমাদের স্বাস্থ্যপান বা টোস্ট করা হবে।

ব্যস, খেল শুরু। আটজন চৈনিক কর্তা একেকটা ছোট পাত্রে ওই মাওতাই ঢেলে ফেললেন। নিজেরা একেকজন একটা পাত্র তুলে ধরছেন, আর আমাদেরকে দুটো এগিয়ে দিচ্ছেন।

ঈসস্! কী ভয়ংকর! গলা দিয়ে বিস্বাদ তরল জ্বলতে জ্বলতে নামছে। চিনারা কিন্তু একজন একটা নিয়ে থেমে যাচ্ছেন, পরেরজন রিলে শুরু করছেন। আমরা দুই অতিথি কমন, আমাদের টোস্ট বা রোস্ট চলছে তো চলছেই।

মাই গুড্‌নেস। চোখ ঝাপসা, মাথা টলমল করছে...। আমাদের কি এই দিশি আট পেগ টানতে হবে ? তাহলে তো ভূমিশয্যা অবশ্যম্ভাবী!

রক্ষে কর বাপু, ভিক্ষে চাই না, কুকুর ঠেকাও। মিলিন্দকে ইশারা করে উঠে দাঁড়ালাম, ওয়াশরুম কোনদিকে? মিলিন্দও উঠে পড়েছে। ওদের একজন এগিয়ে টয়লেট দেখিয়ে গেল। ভিতরে ঢুকে ভারমুক্ত হতে হতে ঠিক করে ফেলেছি, পালাও, পালাও!

লিফট ছেড়ে সিড়ি দিয়ে নামছি উর্ধ্বশ্বাসে। মেলট্রেনের স্পিডে মেন গেট দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু বেরিয়ে তো এলাম, যাব কোনদিকে? মিলিন্দর মাথা পরিস্কার, বলল, নিয়ারেস্ট মেট্রো স্টেশন খুঁজে বের করতে হবে। তারপর ম্যাপ দেখে ডংজিমেন। সে সকালেই স্টেশনে ঢুকে তার ফোনে মেট্রো লাইনের ছবি তুলে নিয়েছে।

এটা একটা বাস স্টপ। এক তরুণ দাঁড়িয়ে। মিলিন্দ একপা দুপা তার দিকে এগোতেই সে সাঁ করে প্রায় ছুটে অনেকটা দূরে চলে গেল। আরে ভাই, আমরা কি চোর-ডাকাত নাকি রে ! দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখছি, ওই ছেলেটা একপা একপা করে আবার বাস স্টপের কাছে এগোচ্ছে। মিলিন্দ ডাক দিল, হ্যালো, হাই !

অমনি ছোকরা আবার ছুটে চলে গেল প্রায় কুড়ি গজ দূরত্বে। এ তো মহা মুশকিল ! হোটেলে গিয়ে জিগ্যেস করারও উপায় নেই। আবার টেনে ধরে গিলতে বসিয়ে দেবে। এদিকে ঘড়িতে প্রায় ১০ টা। ট্রেন কতক্ষণ চলে, কে জানে! হেঁটেও পৌঁছতে পারব না। গুগল ম্যাপ নেই।

এইসময় ঠিক দেবদূতীর মতো এক তরুণীর আবির্ভাব হল। মিলিন্দ বেপরোয়া। এগিয়ে গেল। পিছু পিছু আমি। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে। মেয়েটি তার কথা শুনছে, ভয়েস রেকর্ড করছে, তারপর চাইনিজে ট্রান্সলেট করে মাথা নাড়ছে।

মিনিট পাঁচেক এরকম ভাষা যুদ্ধের পরে তরুণী আকারে ইঙ্গিতে আমাদের ডিরেকশন দিয়ে দিল। আমরা প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলাম। এবং অবশেষে স্টেশনে যখন পৌঁছতে পারলাম, দেখলাম, ওই লাইনের লাস্ট ট্রেন ১০ টায়। তারপরে দুবার ট্রেন পালটে এসে নামলাম, না ডংজিমেন নয়, ডংসিশিটাও। মিলিন্দ মেট্রোর ম্যাপ দেখে জানাল, সেটা একই জায়গা। লাইন আলাদা বলে নাকি নাম আলাদা। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সে ছিল বলে তবু হোটেল পৌঁছতে পেরেছিলাম।...

আজকেও সকালে ব্রেকফাস্টের পর কিছু জোটেনি। মেলা গ্রাউন্ডে কফি বিস্কুট কেক খেয়ে রয়েছি। আজ কিছুতেই রেস্তোঁরায় যাব না ! ম্যাগি দিয়েই ডিনার করব। পেট না ভরে, না ভরুক।

দুজনে ডংজিমেন স্টেশন থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটছি। সন্ধে নেমে গেছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। মনোরম পরিবেশ। দুপাশে প্রচুর দোকান, কিন্তু দুর্বোধ্য। এইসময় আমার নজরে পড়ল, মিলিন্দ, দ্যাখো, দ্যাখো। আমাদের দেশের খাদ্য গো।

হ্যাঁ, তাই তো! চিকেন এগ রোল।

ইয়েস্‌স। তবে চিকেন কনফার্ম বলা যায় না, ব্যাং শুয়োর গরু যা কিছু হতে পারে। সে হোক, অসুবিধে নেই। ডিমটা শিওর। দাঁড়াবে নাকি?

অফ কোর্স। আজ এটা দিয়েই আমাদের জব্বর ডিনার হয়ে যাবে। আর নুন এরা দেয় না, জানি। আপনি এনেছেন না?

নিশ্চয়ই। ওটা আমাকে একজন চিনফেরত বলে দিয়েছিল। চলো, কাছে যাওয়া যাক।

একেবারে আমাদের দেশের মতো রোল কর্ণার। চাকা লাগানো গাড়ি। এক বয়স্কা মহিলা বানিয়ে দিচ্ছে। সামনে একজন খদ্দের। ডিমের ক্রেট রাখা আছে চালের লফটে। একটা থালার ওপর মাংসের টুকরো। রুটির মতো বেলছে, তেল দিয়ে গ্যাসে সেঁকছে, ডিম ফেটিয়ে তার উপরে দিচ্ছে। সবশেষে মাংস আর রাজ্যের কাচা পাতাপুতি। নিবিষ্ট হয়ে লক্ষ্য করে যাচ্ছি চাতক পাখির মতো।

খদ্দের চলে যেতেই মিলিন্দ সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হাত পা নেড়ে বোঝানোর চেষ্টা করল, আগের জনকে যা দিয়েছ, আমরাও তাই চাই।

মহিলা হাঁ করে চেয়ে আছে। শেষে মিলিন্দ ফিজিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন শুরু করল। রুটি বেলা দেখাচ্ছে, বার্নারে সেঁকা দেখাচ্ছে, ডিম উপর থেকে নামিয়ে আনা দেখাচ্ছে, তার উপরে মাংস ছড়ানো .... সব। এবার মহিলা হেসে ফেলেছে।

নাঃ, বাকি সব বুঝে গেলেও ডিমের অংশটা বুঝতে পারছে না। মিলিন্দ যত ইশারা করছে, চালের বাতা থেকে নামাও, ডিমের শেপ দেখাচ্ছে, মহিলা গালে হাত দিয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে।

ততক্ষণে মিলিন্দ পুরোপুরি ফ্রাস্টেটেড। খানিকক্ষণ মহিলার দিকে চেয়ে থেকে সে এবার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করল। জনবহুল ওই রাজপথে মিলিন্দ নিজে মুরগি, উবু হয়ে বসে কোঁকোঁর কোঁ ডাক দিচ্ছে আর নিজের তলা থেকে ডিম পেড়ে বার করছে।

মহিলা পাক্কা বুঝে গেল। হাত বাড়িয়ে ডিম নিয়ে দেখাল মিলিন্দকে। তখন মিলিন্দর আনন্দ দেখে কে! তার বডি ল্যাংগুয়েজ ফুল মার্কস পেল এতক্ষণে।

এ দৃশ্য সারাজীবনেও ভুলব না।

সংকলন ২০২০-তে প্রকাশিত

স্টেপলার

চুমকি চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম আর লাভলিন কে দেখে আমার রীতিমতো হিংসে হয়। এরকম হ্যাপি কাপল আমি খুব কম দেখেছি। কম দেখেছি বলা ভুল, দেখিইনি কোনোদিন। দুজনেই চাকরি করে। আগে একই অফিসে ছিল। সেখান থেকেই প্রেম। পরে লাভলিন অফিস বদল করে। কিন্তু দুজনের অফিসই এক এলাকাতে। সল্ট লেক, সেক্টর ফাইভ। আমাদের বাড়ির পাশেই যে ভাঙাচোরা পুরোনো বাড়িটা ছিল, সেটাই এখন প্রোমোটিঙের কল্যাণে চারতলা বিল্ডিং। প্রতি ফ্লোরে দুটো করে ফ্ল্যাট। সেই বিল্ডিংয়েরই দোতলার উত্তরমুখী ফ্ল্যাটটা ওদের। আমার ঘর থেকে ওদের কিচেনটা দেখা যায়। লাভলিন কাজ করে যখন প্রায়ই দেখি সপ্তম এসে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ওকে। হামি খায় গালে। লাভলিন ত্রস্ত হয়ে আমার ঘরের দিকে তাকায়। ও জানে আমি খাটে বসে থাকি আর সেখান থেকে ওদেরকে পরিষ্কার দেখা যায়। আমি চট করে শুয়ে পড়ি যাতে ওরা অস্বস্তিতে না পড়ে। কিন্তু শরীর গরম হয়ে ওঠে আমার। আমারই বা কি বয়েস ! সাঁইত্রিশ বছর। ভালোবাসাবাসি দেখে তেতে ওঠা অস্বাভাবিক কি ? তাও আমি মলয়ের কথা মাথায় আনিনা। কিছুতেই না। আমি তো মন দিয়েই সংসার করতে চেয়েছিলাম। মলয়ের অনেক শর্ত মেনে নিয়েছিলাম। খেতে বসলে তবেই গরম রুটি সেঁকে থালায় দিতে হবে, সব ভাজা গরম ভেজে দিতে হবে, ঘুম থেকে উঠেই নাইটি ছেড়ে ফেলতে হবে যাতে বাইরের লোকের নজরে না পড়ে। দিনের বেলা বারান্দায় বেশিক্ষণ দাঁড়ানো চলবে না। অত্যাধিক সন্দেহবাতিক। তাও তো কিছু বলিনি কোনোদিন। আমার শুধু একটাই দাবী ছিল, আমাকে প্রাণভরে ভালোবাসতে হবে। স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির ভাগ কাউকে দেয় দিক কিন্তু আমার প্রতি মলয়ের ভালোবাসার এক কণা ভাগও আমি কাউকে দেব না। তার জন্য দরকার হয়, সন্তানই নেব না আমি। কিন্তু কী করল মলয় ? আমারই মাসতুতো বোনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ল শুধু নয়, তারও বেশি কিছু ঘটল। সুস্মিতার অ্যাবরশনের ব্যাপারটা কিছুদিন পরে কানে এসেছিল। ততদিনে বাপের বাড়ি চলে এসেছি আমি। চরিত্রহীন স্বামী অতএব ডিভোর্স পেতে অসুবিধে হয়নি। খোরপোষ চাইনি। ওই ছোটলোকের কোনো স্পর্শ আমি পেতে চাই না। বাবা মাও আমার মতেই মত দিয়েছিলেন। বাবা বলেছিলেন, চব্বিশ বছর যখন আদর যত্নে রাখতে পেরেছি, ওর বাকি জীবনটাও সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করতে পারব। কারুর দাক্ষিণ্য চাই না। আমার কথা এর বেশি বলার কিছু নেই। এবার ওদের কথা বলি। ছুটির দিনে ছাদে ওঠে ওরা। আমি রোজই উঠি ছাদে। জানোয়ারটাকে ছেড়ে চলে আসার পর কারুর বাড়িই যাইনা কারণ, মনে হয় যেন সবাই আমাকে বিশেষ নজরে দেখছে। ভুল ধারণাই হয়তো। তাও, কোথাও যাইনা। ছাদটাই আমার একমাত্র নিশ্বাস নেবার জায়গা। ছাদ থেকেই আলাপ হয়েছিল ওদের সঙ্গে। লাভলিনই প্রথম কথা বলেছিল।

– আমরা এখানে নতুন তো তাই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই। কথায় হাল্কা অবাঙালি টান আছে খেয়াল করলাম। ও নিজেই বলল, 'আমি লাভলিন। আমার হাসব্যান্ড সপ্তম ঘোষ। আমার বাবা বাঙালি, মা পাঞ্জাবি।'

– ও আচ্ছা। কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের ?

– আমাদের আপনি করে বলবেন না। বিয়ে হয়েছে দেড় বছর। আগে হলদিয়াতে থাকতাম। সপ্তম একটা বড় ফার্মাসিউটিকাল কম্পানিতে আছে। আমি আইটিতে আছি।

– খুব ভালো। তোমাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালো লাগল। পাশাপাশি আছি যখন, কথা তো হবেই। এসো একদিন আমাদের বাড়ি। এটা ছিল আলাপের প্রথম পর্ব।

এরপর অজস্র কথা হয়েছে ছাদে ছাদে। একদিন লাভলিন এসেছিল আমাদের বাড়ি মৌরলা মাছের টক শিখতে। সপ্তম নাকি খুব ভালোবাসে কিন্তু লাভলিন রেসিপিটা জানে না। মা সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছিল রান্নাটা। কিছুক্ষণ আমার সঙ্গেও গল্প করে গেল। আমার বিষয়ে কৌতুহল হওয়া খুব স্বাভাবিক। আমি সংক্ষেপে যতটুকু বলার বলেছি। লাভলিনের মুখটা দেখে মনে হল, আমার কথা শুনে গভীর দুঃখ পেয়েছে ও। নীচু গলায় বলল, 'ইস্, এমন রূপসী বউ থাকতে এরকম কেন করল ! ভালো করেছ চলে এসেছ।' যাবার সময় বলে গেল, 'আমাদের ফ্ল্যাটে একদিন এসো দিদি। আমরা অনেক গল্প করব আর সপ্তম চা করে খাওয়াবে। খুব ভালো মশলা চা বানায় ও। আমি শিখিয়েছি কিন্ত এখন ওই বেশি ভালো বানায়। তুমি আমার ফোন নাম্বারটা রাখো। তোমারটাও দাও আমাকে।'

বেশ মিষ্টি মেয়েটা। সপ্তমও খুব স্মার্ট ছেলে। ড্রেসিং সেন্স আছে ছেলেটার। কথাবার্তাও ভালো। দেখি, একদিন যাব ওদের ফ্ল্যাটে। গত বুধবার গেছিলাম ওদের ফ্ল্যাটে। পনেরোই অগাস্টের ছুটি ছিল। লাভলিনকে ফোন করে নিয়েছিলাম আগেই। ও উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, 'ও হাউ নাইস, প্লিজ এসো।' নারকোলের তক্তি বানিয়েছিলাম সেদিন সকালে। তার থেকেই খানিকটা নিয়ে গেছিলাম। সপ্তম দেখলাম খুব আগ্রহ নিয়ে তখনি খেতে শুরু করে দিল। লাভলিন বলল, 'একটা অ্যাটলিস্ট রেখো আমার জন্যে।' আমি বললাম, 'পুরোটা খেয়ে নিলেও অসুবিধে নেই। আমি তোমার জন্য আবার দেব। বাড়িতে আছে।' বেশ রুচিসম্মত সাজানো ফ্ল্যাট। হবারই কথা। ওদের দেখেই সেটা বোঝা যায়। অনেক গল্প করলাম। সুন্দর মেজাজে বাড়ি ফিরলাম। কেমন চন্দনের গন্ধ পাচ্ছিলাম চারপাশে। শরীর মনে সুখ জাগলে এমন গন্ধ ছড়ায়। বিয়ের পর প্রথম কয়েক বছর সুগন্ধময় জীবন ছিল আমার। তাই আমি জানি। এখন প্রায়ই যাই ওদের বাড়ি।

সেদিন ছিল লাভলিনের জন্মদিন। হলুদ রঙ ওর খুব পছন্দ। তাই হলুদ গোলাপের একটা বোকে আর মুক্তোর একজোড়া কানের টপ গিফ্‌ট দিলাম। লাভলিন খুব খুশি। সপ্তমও এখন আমার সঙ্গে খুব ফ্রি হয়ে গেছে। রীতিমত ইয়ার্কি মারে। বার্থডে পার্টিতে আমার দিকে ইশারা করে করে 'হোঁঠো সে ছুলো তুম, মেরা গীত অমর কর দো' গানটা গাইছিল। একবার ওর হাতটা আমার কোমর ছুঁয়ে গেল। আমি কিছু মনে করিনি। ছোট জায়গায় ঘুরে ঘুরে গাইছে, লাগতেই পারে। ওদের জন্য আমার একঘেয়ে জীবন কিছুটা প্রাণ পেয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, কিচেনে এসে সপ্তম যেন আমার ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কিন্তু এখন আর আগের মতো ওরা কি করছে, তা দেখিনা। তাই বেশির ভাগ সময়েই নেটের পর্দা টেনে রাখি। আমাদের বাড়ির সব জানলাতেই দুটো করে পর্দা। সেদিন দুপুরের দিকে হঠাৎ বাবার শ্বাসকষ্ট শুরু হল। কদিন ধরে সর্দি কাশিতে ভুগছিল কিন্তু বুকে যে কফ বসে গেছে সেটা বুঝতে পারিনি। ডাক্তারবাবুকে ফোন করতে উনি বললেন, 'আমি তো আউট অফ স্টেশন। নেবুলাইজার দিন। একটু স্টেডি হলে হসপিটালে ভর্তি করুন।' এক নিমেষেই লাভলিনের কথা মাথায় এল।

– বলো দিদি।

– বাবার নেবুলাইজার লাগবে। সপ্তম পারবে তাড়াতাড়ি জোগাড় করে দিতে ?

– ওর ফোন নম্বর দিচ্ছি। এখুনি ফোন করো। আমার ফোন পেয়ে সপ্তম বলল, 'আমার ফ্ল্যাটেই আছে। আমি এখুনি যাচ্ছি, গিয়ে কল করছি। মিনিট পনেরো বাদে সপ্তমের ফোন এল।' আপনি যদি কষ্ট করে আসেন তাহলে কি ভাবে ইউজ করবেন সেটা বুঝিয়ে দেব। অফিস থেকে না বলে বেরিয়ে এসেছি, তাই একটু তাড়া আছে। লজ্জা লাগল আমার। নিজেদের ব্যাপারে অন্য কাউকে বিরক্ত করতে ভালো লাগে না। কিন্তু এটা যে এমার্জেন্সি ! বাড়ির পোশাকেই দৌড় লাগালাম প্রায়। হাঁফিয়ে গেছিলাম। সপ্তম নেবুলাইজার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

– দেখে নিন। আমি ওর কাছাকাছি গেলাম।

– ওহো, ঘেমে একদম চান করে গেছেন। লুকিং সেক্সি ! আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ও বলল, 'একটা কিস করতে দেবেন প্লিজ। আপনার ঠোঁটটা না ইউনিক। পেনেলোপ ক্রুজের মতো। কমলা লেবুর কোয়া যেন। আমি বেরিয়ে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই সপ্তম বলল, 'মেসোমশাইয়ের কি খুব ব্রিদিংট্রাবল হচ্ছে ? এই বয়েসে খুবি রিস্কি। 'যন্ত্রের মতো এগিয়ে গেলাম সপ্তমের কাছে। যদিও বেশি সময় নিল না ও। শুধু জিগ্যেস করল, 'ভালো লাগল ?' তারপর দ্রুত বুঝিয়ে দিল যন্ত্রটার ব্যবহার। আমি পাগলের মতো ছুটে বাড়ি পৌঁছে বাবার মুখে নেবুলাইজার চেপে ধরলাম। বাবা ভালো আছে। কিন্তু আমি ? অচেনা দুর্গন্ধ ইদানীং সারাক্ষণ ঘিরে থাকে আমাকে। অনেক কষ্টে এই গন্ধের হাত থেকে মুক্ত করেছিলাম নিজেকে। লাভলিনের জন্যেও কষ্টে বুক ফাটে। একদিন কথায় কথায় ওকে বলেছিলাম, 'তোমাদের দেখে খুব ভালো লাগে আমার। সারাটা জীবন এভাবেই থেকো।' লাভলিন বলেছিল, 'সপ্তমকে স্টেপলার দিয়ে গেঁথে নিয়েছি আমার সঙ্গে। কেউই নড়ব চড়ব না।' দুজনেই খুব হেসেছিলাম সেদিন। স্টেপলারের পিনের সামনেটা দেখে লাভলিন কোনোদিন বুঝতে পারবে কি যে উল্টো দিকের মুখদুটো খোলা ?

হারানো ঠিকানা

শুভ্র দাস

ফ্রেমের ছবিটা হলদে হয়েছে আজ,
শুকিয়ে গিয়েছে রজনীগন্ধা স্টিক।
বাসি হয়ে গেছে কাল রাত্রের সাজ,
চাই না কেউ আর আমার ঠিকানা নিক।

এলোমেলো শুধু পড়ে আছে বাটি গ্লাস,
এলোচুল খুলে কে যেন ঘুমিয়ে আছে,
খোঁপার মালাটি ফেলেছে দীর্ঘশ্বাস,
ঠিকানা আমার বাতাসে হারিয়ে গেছে।

"ঠিকানা চাও?" বলেছেন সুকুমার,
আমড়াতলায়, জীবনের বাঁকে বাঁকে,
অলি গলি ঘুরে বার বার জেরবার;
রোগটা কঠিন, জীবন নামে যা ডাকে।

"ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু" আজ,
কিশোর কবি যা চেয়েছিলো সেই কবে।
পথে পথে ফেরে মানুষের কত কাজ,
হারানো ঠিকানা পথেই চিনতে হবে ।

দমকা দখিনা ছাই রঙা আজ যেন,
মেঘেরা ভাসছে, পাখিদের ডানা ভার।
হাওয়াতেই নাম, কান পেতো, শুনো;
হেঁকে বলে যায়, নামেই ঠিকানা তার।

প্রশ্ন : নদীর কাছে

সুনন্দা বোস

নদীটির কাছে
কিছু কথা শুধোবার আছে।
পাহাড়ের চূড়ো থেকে –
কেন সে এসেছে নেমে,
কে ডেকেছে তাকে ?
কেন সে নিয়েছে এতো ব্যথা,
কে তাকে বলেছে কটূ কথা,
কেন সে ছেড়েছে বাসা –
জন্মস্থান, এতো ভালোবাসা ?
এঁকেবেঁকে ছুটে যাওয়া –
সমুদ্রের টানে,
কে সেধেছে, কে ডেকেছে –
কে গান গেয়েছে তার কানে ?
কোন অভিমানে, সব ফেলে
ছুটেছে সে, কোথায় কে জানে ?
দুরন্ত আবেগে, ভেসে গেছে –
ভেঙেছে দুকূল তার
ঠিকানা মিলেছে অবশেষে ?
বাড়িয়েছে সমুদ্র তার হাত ?
মুছে গেছে অভিমান, জ্বালা ?
তবুও থামেনি কেন চলা ?
অবিরাম খুঁজে যাওয়া
দুকূল প্লাবিত করে –
কি কথা আজো তার
হয়নিতো বলা ?

বাঁচতে চাই

রমা জোয়ারদার

কথার কথকতায় আসল কথাটা
বারবার হারিয়ে যায়।
আসল কথা তো একটাই –
"আমি বাঁচতে চাই।"

বহুযুগ আগে রামের বউ সীতা
অথবা পাঁচ-পাণ্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদী –
আর, তার কতকাল পর
সুবর্ণলতা, নির্ভয়া, অভয়া
আর পার্কস্ট্রীটের সেই মেয়েটা –

শুধু এদেশ তো নয়,
সারা পৃথিবীর কত শত নারী
বাঁচতে চেয়েছিল মাথা উঁচু করে
নিজেদের মতো করে।

তারা সকলেই সতেজে চিৎকার করে
একটা কথাই বলতে চেয়েছিল –
"আমি বাঁচতে চাই!"
কিন্তু ওদের চিৎকার টুকরো টুকরো হয়ে
খান খান হয়ে ছড়িয়ে গেল।
কতজন এল কতদিক থেকে
তুলে নিল সেই কথার টুকরোগুলোকে
সাজিয়ে নিল নিজেদের মত।

তারপর –
উঠলো ঝড়, উঠলো তুফান।
আবার কথার ফোয়ারা ছুটলো
দিকে, দিকে।
কিন্তু –
ছড়িয়ে ছিটিয়ে হারিয়ে গেল আসল কথাটাই।
সেটা তো ছিল শুধু একটাই –
"আমি বাঁচতে চাই!!"

আজকাল

মানস ঘোষ

স্বপ্নে মিম আসে
কখনো দানা বাঁধে রিল
স্ক্রল করতে থাকি
নির্জন অবসরে জমা হয়
রেসিপি থেকে এসি সারানোর
প্রাচীন ভিডিও সম্পদ
ঋদ্ধ হই অজানা কেচ্ছায় বিশ্বব্যাপী
দাঁড়ি কমা হীন ট্রোল সমুদ্রে গলা ছাড়ি

নিজেকে মূর্তিমান টাইফুন মনে হয়
ওদিকে বিশ কে'র ক্রিয়েটর হেঁকে বলে
এতো রিল কেন!

নোটিফিকেশনে দেদার লাভ আর

অসাধারনের মাঝেও চমকে উঠি

হীন থেকে হীন অটোকারেক্ট হতে হতে
আবার ঘুমিয়ে পড়ি
সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার আগেই আসে

স্বপ্ন
গাঢ়তর এবং আদ্যান্ত সৃষ্টিশীল
জন্ম নেয় অমেয় আমোদগেঁড়ে
যাপনের রিলচিত্র।

একটু উষ্ণতার জন্য

রুদ্রশংকর

একটু উষ্ণতার জন্য
বহুবার ভুল মানুষের পাশে ঘুমিয়েছি
লোকালয় ভেঙে নিষিদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে দেখেছি
আনন্দ নামের নীলাভ শরীর
আর তখনই বোধ জুড়ে বৃষ্টি নেমেছে

আমার চারপাশে
কোথাও কোন মাঠ নেই, নদী নেই
কেবল অন্ধকার গিলে খাচ্ছে প্রেম
একটা নির্বাক পাখি আঁচড় কাটছে দরজায়
পড়ন্ত বিকেলের দিকে তাকিয়ে
তুমি আসবে? ভিজবে বৃষ্টিতে এশবার?

২০২৩ দেশে ফেরা

বালার্ক ব্যানার্জী

Pandemic এর পর দেশে ফিরে
কই? কেমন লাগছে ? বললে না?
মোড়ে মোড়ে নতুন ক্যাফে খুলেছে
উপচে পড়ছে বই মেলা।
বিয়ে বাড়ি আবার জমে উঠেছে
মাস্ক ছাড়া মজাই আলাদা
পার্ক স্ট্রীটএ আবার ট্রাফিক জ্যাম
ডোভার লেনে জলসা।
অ্যাকাডেমি তে আবার নাট্যোৎসব
নন্দন চত্ত্বর জমজমাট
ভাঙ্গা ব্রিজ আবার জুড়ে গেছে
ঝলমলে মাঝেরহাট।
বাস, মেট্রো ভিড়ে ভিড়াক্কার
চার দিকে মানুষের গাদাগাদি
কিন্তু সেই ভিড়ের মধ্যেও
এক একটা সিট কিন্তু খালি।
অ্যাকাডেমি হাউস ফুল হলেও
অনেকের টিকিট আর কাটা হয় না।
বই মেলায় তাদের প্রিয় উপন্যাস
এই বছর থাকবে তাকে রাখা।
চলে গেলো তারা।
হিসেব তো কিছুই মিলল না।
শহীদ হল, কি বলি
তাও ঠিক জানি না
ময়দানে ঘুরে খুঁজে পেলাম না
কোনো মনুমেন্ট তাদের স্মৃতিতে
তাদের জন্য কোনো দিবস হল না
কোনো সরণি তাদের নামে।
কোনো মঞ্চে আর পালন করা হয় না
দু মিনিট নীরবতা
দেহের প্রাচুর্য্য বলেই হয়তো
প্রাণের দাম এত সস্তা।
Pandemic তো মিটে গেছে
এবার ভুলে যাওয়ারই পালা
শুধু এবার দেশে ফিরে
অনেকের সাথে আর দেখা হলো না।

মহাপৃথিবী

তপনজ্যোতি মিত্র

সে এক অসম্ভবের দিনে মা একহাতা ভাত বেড়ে দিলেই স্বর্গের গন্ধে ভরে উঠতো কাঙালঘর।

যার কোনো ঐশ্বর্য নেই সেই এক দীন মানুষও যেন ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে স্বর্গের গন্ধ অনুভব করতো।
কখনো মা বলে উঠতো – গৌর, অপেক্ষা করো বাবা।
ছোট ছেলেটি ভাবতো – কাকে গৌর বলছে মা ?
তাকে না রাস্তার সেই দীন দয়াল মানুষটাকে যার আর কোন পৃথিবী নেই।

তার খাওয়া শেষ হলে মা বলতো – খোকন, গৌরদয়ালকে খাবার দিয়ে এসো বাবা।
সেই এক মুঠো ভাত, মায়ের হাতে অমৃত গৌরদয়াল কী তৃপ্তি ভরে খেত।

বড় গরীবের পৃথিবী, নিরন্নের পৃথিবী, দীনতমের পৃথিবী।
তার মধ্যেই মাঝে মাঝে কোন একদিন ভাতের। স্বর্গের মতো সেদিন।
এক মৃদু আলোর মত রাত জেগে থাকতো মা, সন্তানের মঙ্গল কামনায়।
ছেলে কি ঘুমালো ?

মা কত গাছ লাগিয়েছিল। ফুলের, ফলের।
যখন ফুল ফুটতো, ফল ধরতো – মা কেমন মমতায় তাদের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো।
বলতো – গৌর, দেখো গাছেদের জীবন আর আমাদের জীবন।
তারা কেমন শেকড়বদ্ধ, কত আত্মীয়তা তাদের।

মা যে শুধু জীবনের ভালো দিকগুলো দেখতে চেয়েছিল, শেখাতে চেয়েছিল।

মাঝে মাঝে গৌর বলতো – বাবা কই মা ?
সে প্রশ্নে মা চুপ করে যেত।
সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাওয়া মানুষটার কথা ভেবে তার কষ্ট হতো নিশ্চয়।
তারপর বলতো – স্বর্গের দিকে গেছেন তিনি।

এক একদিন প্রবল জ্যোৎস্নায় ভরে যেত ঘর।
আর কে যেন গাইতো – আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে।

মায়ের গাওয়া এই গানে কেন লেগে থাকত হাহাকার ?
মা কি বুঝতো সবাই জ্যোৎস্না রাতে বনে যেতে পারে না।
করুণ মানুষের পৃথিবীর কোনও জ্যোৎস্না নেই। শুধুই কৃষ্ণপক্ষ।

এরকম এক কৃষ্ণপক্ষের রাতে মা শেষঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল।
তখন প্রবল শ্বাসকষ্ট উঠেছে।
তবু তার মাঝেই মা দরজার দিকে হাত দেখাল।

মা কি বলতে চেয়েছিল ?

স্বর্গের দুয়ার থেকে কেউ ফিরে আসবে ?
যে ফিরে এলেই সব মুশকিল আসান ?
সব দিন ভাতের গন্ধ।
সব দিনই স্বর্গ এই মর্ত্য পৃথিবীতে।

কখনো কখনো মায়েরা যে মহাপৃথিবী হয়ে যায় !

গৌর তখন বুঝতে পারে, যা মা তাকে বোঝাতে চেয়েছিল চিরকাল –
ঘরের গৌরের সঙ্গে পথের গৌরদয়ালের কোনো পার্থক্য নেই।

ব্রেন মশালা

অতীশ ব্যানার্জ্জী

কড়াতে একটু গরম তেলে লঙ্কা ফোড়ন জিরে –
মেয়ে আমার সোনার টুকরো, ছেলে একদম হীরে।
তাইতো ঠেসে অঙ্ক কষে, মুখে গোঁজা মোটা বই
পেঁয়াজ কুচি, টম্যাটোর ক্বাথ আর একটু টক দই।
তার উপরে নিয়ম কানুন সমাজ যেমন চায়,
যায় না দেখা এমন বেড়ি পরিয়ে রাখা পায়ে –
নুন ঘি আর ভাজা পেঁয়াজ, গরম মশলা গুঁড়ো;
গরম ভাতের ফ্যান ঝরছে ধোঁয়ায় ভরা পুরো!
ঝলসে কচি মাথাগুলো, স্বপ্ন মৃত চোখে,
গরম ভাতে হচ্ছে মাখা, ঢুকছে হাতের নখে।
তেপান্তরে দিক ভুলেছে পক্ষিরাজের ডানা –
কাদার থালায় নখের আঁচড় আঁকছে আলপনা;
খাচ্ছে সমাজ পাত পেড়ে সব ব্রেন মশালা ভোজ –
স্বপ্ন ছোঁয়ার পরাধীনতার সঙ্গে আপোশ রোজ।
তারাও যখন শক্তি পাবে রক্তলোলুপ ছুরির –
রান্নাঘরে কষবে মগজ, মিথ্যে বাহাদুরির!

বিচার

অলকেশ দত্তরায়

ছুরিটি রয়েছে পড়ে টেবিলের পাশে
গায়ে রক্ত লেগে নেই অদৃশ্য রঙের
পাত্রে রাখা লাল রং তরল গেলাসে
আপেলের কাটা ত্বক মরমী ঢঙের

মানুষই ছবি আঁকে ক্যানভাস জুড়ে
সেই মানুষই ছুরি হাতে তুলে নেয়
চামড়া কেটে মানুষেরই লাল রক্ত পড়ে
রং মাখা তুলি দেখে তারও পরিচয়

পরিচয় বহুজনে করে গেছে আগে
শিল্পীও জানে বোঝে এই দ্বিচারিতা
নিহত গোলাপ কাঁদে রাগে অনুরাগে
বিচার পায় না খুনি চেনা কথকথা

মানুষ তুমিই জানো কে করবে বিচার
চেনা অচেনায় মিলেমিশে একাকার

ভারতবর্ষ

আনন্দ সেন

বাড়ির সামনের মাঠটার কাছে
যেখানে আমার শৈশব গচ্ছিত আছে
সেখানে আমিনা আমাদের সাথে খেলতে আসত
পাশের বস্তি থেকে, ধুলোর ঝুল মেখে
আমি যখন আমাদের লক্ষ্মী ঠাকুরকে
বাতাসা আর নকুলদানা থালাতে বেড়ে দিতাম
তখন আমিনা কে নিয়ে তার আব্বু আজানে বসত
লক্ষ্মীপুজোর খিচুড়ি আর পীরবাবার মসজিদের
প্রসাদী প্যাঁড়া দিয়ে আমাদের চড়ুইভাতি হত নদির ধারে
ঝুলনের মেলা থেকে একবার আমি একটা হাতবালা
কিনে দিয়েছিলাম আমিনাকে
তখন বাতাস ছিল অমলিন, রোদে ছিল আনন্দ
রক্তে কোন জাত ছিল না

তারপর একদিন
উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম
থেকে হাহারবে ছুটে এল
বিষ মেশানো কালো ধোঁয়া
সে ধোঁয়া মারে না, মারতে শেখায়

আমার আশি বছরের দাদু বলেছিলেন
আমিনারা দলিত মুসলমান, নীচু জাত
ওদের সাথে মিশতে নেই
তখন জানতাম না, তাই বলতে পারি নি
ভারতবর্ষের সংবিধান লিখেছেন এক দলিত
আর "সারে জাঁহাসে আচ্ছা" গানখানি মুসলমানের লেখা
বারান্দায় রোদ পোহাতে পোহাতে দাদু বলতেন
ওদের বিশ্বাস করা যায় না।

দেশভাগের পরপর ওপার থেকে রাতারাতি
আমের বাগান, ক্ষেতজমি আর জ্বলন্ত ঘরবাড়ি
ফেলে চলে এসেছিল দাদুরা
ছেলেবেলার উঠোনে দাদুর আর ফিরে যাওয়া হয় নি।

বিশ্বাস করতে পারিনি বলেই
কিছু অন্ধকারের লোকের
ক্রিয়াকর্ম একটা জাতের
দায় হয়ে যায়
বিশ্বাস করতে পারিনি বলেই
পাড়া থেকে পাড়া ভাগ হয়ে যায়
মন্দির থেকে মসজিদ
ভেঙে তৈরি হয় মন্দির
এক ধর্মের রক্তের উপর
আর এক ধর্মের হাড়গোড় জমা হয়।

যেদিন গোধ্রা হল,
পাড়ার দাদারা বলেছিল
ওরা যদি পাঁচশো মারে
আমরা হাজার মারব
যেদিন বাবরি মসজিদ ভাঙল
বাড়িতে বাড়িতে মিষ্টি বিতরণ হল
সারারাত পুড়ল বাজি।

একদিন রাতে আমিনা বাড়ি ফেরেনি।
দুদিন পরে তার
ঝলসে যাওয়া শরীর পাওয়া যায় খালের জলে
শরীরে অনেক দাঁত আর নখের দাগ ছিল
সে জন্তুগুলো দুপেয়ে

আমিনার পোড়াকাঠ হাতে
পরা ছিল হাতবালা

না, কাগজে কোন খবর বেরোয় নি
ঠিক সাতদিনের জন্য
বুদবুদ উঠেছিল ওদের বস্তিতে
কাউন্সিলর কিছু থোক টাকা
ধরে দিয়েছিলেন আমিনার পরিবারকে
তারপর সব সূর্য আর চাঁদের নিয়মে চলেছে
রক্তে এখন জাত আছে, উত্তাপ নেই

আমি মাঝরাস্তায় হাঁটতে চেয়েছিলাম
দুধারের রাস্তারা সরে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে
এক রাস্তা থেকে নারা আসছে
জয় শ্রীরাম
অন্য রাস্তা থেকে জিগীর উঠছে
আল্লাহ হো আকবর
আর অতলস্পর্শী খাদের মাঝে
তলিয়ে যেতে যেতে
আমি শুনতে পাচ্ছি
অনেক দূর থেকে কেউ
চীৎকার করে জানতে চাইছে

স্কোর কত হল?

বাবুল্ পেড়্

শাশ্বতী বসু

হাঁ হাঁ সফাই তো কাল্ সে হি চালু হো যয়গা । আপ্ ফিক্র মত্ কিজিয়ে জী – আশ্বস্ত করে নীরজ, শুক্লাজীকে ।

– দেখো, শাদী আঠ্ঠারো তারিখ মে । মৎলব অগ্‌লা মাহিনে মে । তুরন্ত দিন যাতা । বীচ্ মে নভ্‌রাত আওর দিওয়ালী কা তেওয়ার হ্যায়, হো যায়গা তো সাফ্ ? শঙ্কিত শুক্লাজী আবারও প্রশ্ন করে ।

কথা হচ্ছিল যোধপুর লাগোয়া পালী জেলার এক আধাশহরতলীতে । শুক্লাজী এই মহাল্লার খানদান বেওসাদার । বাপ দাদাজীর জমিন্ খেতির কাম তো আছেই । তার উপরে অনেকগুলো হোটেলের মালিক হয়ে এবার প্রোমোটারি ব্যবসার দিকে তার একটু নজর পড়েছে । তাই লেড়্‌কির শাদীর সুযোগে এই ধন্তরী জাঙ্গল এবার সাফ হবে । তার বাড়ীর দেওয়ালের লাগোয়া এই জাঙ্গলের সীমানা । তিনি পুরো জাঙ্গলটাই কিনে নিলেন ।

হাত কয়েক দূরে তেলের টিনের দুপাশে তারের আংটা লাগানো ডাব্বা হাতে সাত বছরের ছোট্ট সুর্ভী দাঁড়িয়েছিল । দাঁড়িয়ে ছিল না – দাঁড়িয়ে থাকতে ও বাধ্য হচ্ছিল । তবে পুরো নিজেকে আড়াল করে । নীরজ্ জী আর শুক্লাজী যে জমিটা সাফ্ সুতরো করার কথা বলছিল সেই জমিতেই সুর্ভী বাবুল্ পেড়ু জাঙ্গলে "জাঙ্গল্ সারতে" যায় । হর রোজ হর মাহিনা সুবে ছে বাজে তক্ ।

সে ওঠার আগেই তার আম্মী যায়, তার আম্মীর জেঠানী যায়, চাচী ভী যায়, ভিদ্যা দিদিও যায় ।

অবশ্য তার দাদারা যায় না । তারা হোই দুসরা জাঙ্গল মে যাঁহা নীলা আকরা বহোৎ খুব হোতা উধর কাম সারতে যায় । দাদারাও বলছিল, দেল্লী বেকানেঢ় নয়া রোড নাকি ওদের ঐ নীলা আকরার জমিনের ওপর দিয়ে যাবে । সাফ্ হবে সব জমিন আর বাবুল্ পেড়ু । তখন কী হবে ? কাঁহা মিলেগা জাঙ্গল্? দাদার কপালে চিন্তার ভাঁজ ছোট্ট সুর্ভীরও চোখ এড়ায় নি ।

লোকদুটো এতক্ষণে ফিরে যাচ্ছে বকর বকর করতে করতে । তাই দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুর্ভী । শুক্লাজীর লেড়্‌কি কবিতাদিদির বিয়া হোবে । সামিয়ানা বসবে খানাপিনা হোবে, নাচাগানা হোবে । কম্ সে কম্ দশদিন তো হোবেই । কিন্তু ওরা "নিয়োতো" পাবেনা । ও আর জাটু সামিয়ানার দরয়াজো যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে । এইসব ভাবতে ভাবতে শক্ত হাতে ডাব্বাটা পাকড়ে সুর্ভী আড়াল থেকে সরে এসে বাবুলের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে । জঙ্গলের জমিনে লম্বা লম্বা ঘাস – নাম ও বেশ – ধন্তরী । তাই এই জঙ্গলের নাম ধন্তরী জঙ্গল ।

জঙ্গলের কাজ সেরে ঘরের পানে পা বাড়ায় সুর্ভী । সূর্য তখন বড় বাদাম গাছটার খানিকটা ওপরে উঠে গেছে । হর রোজ সুরজ যখন বাদাম গাছটার পিছে থাকে সুর্ভীর জাঙ্গল সারা খতম হোয়ে যায় । আজ দেরী হোয়ে গেছে । এখন বড় রাস্তা পার হোতে হবে । রাস্তায়ও অনেক গাড়ী । বাস, ট্রাক ও আছে । গাই, বহেল, শুয়ার আর কুত্তাও আছে বহোৎ । ট্রেন স্টেশন ফালনা কাছেই । রাস্তা তাই সরগরম । হুশ হুশ করে ছোট ছোট পেরাইভেট লাল সাদা গাড়ীগুলি যায় । জানলায় খুবসুরাত্ আওরাত্ গুলোর মু দেখা যায় । আঁখো মে ধূপ কী চশমা । আংরেজী বলে কটা মট্ কটা মট্ । এতনা সুন্দার, এতনা সুন্দার , প্রিয়ঙ্কা চোপরা য্যায়সা । যওয়ান হোনেসে বাদ ময়্য ভি আঁখো মে এ্যায়সি চশমা ডালুঙ্গি ...

ভাবতে ভাবতে চলে সুর্ভী । বাড়ীর উঠোনে ঢুকে দেয়ালের পেরেকে ডাব্বা ঝুলিয়ে মটকা থেকে পায়ে জল ঢালে ।

– জানতি বা, আভি ধন্‌তরী জাঙ্গল ভি সাফ হোনে লাগা –

– হুঃ, কৌন বোলারে তু এ বুঢ়ী বাৎ? মা মন্জু বিরাট গামলায় মাখা জওয়ারের আটার দলা হাতের পেষাইতে নরম করছিল। দুইহাত চলছিল দ্রুততালে। মাটিতে বসে ঝুঁকে ঝুঁকে। এসব কাজকর্ম থামিয়ে অবাক হয়ে সে প্রশ্নটি করে।

– হাঁ দো আদমী বাতে করতে থে। এক তো শুক্লাজী। দুস্রা কৌন নেহি মালুম। ম্যায় নে সুনলি জাঙ্গল যানে কা টাইম।

হাত পায়ের ধূলো ঘষে তুলতে তুলতে উত্তর দেয় ছোট্ট সুর্ভী।

সুর্ভীর মায়ের কপালে ভাঁজ পড়ে। এসব কি শুনছে সে। ঐ ধন্‌তরীর মাঠই ওদের এখন জাঙ্গল সারার একমাত্র খালি জমিন। তাও যদি সাফাই হোয়ে যায় তবে যাবে কোথায় তারা। কি ভাগ্যি করে যে ও এ দুনিয়াতে এসেছে, যেদিকে চায় সেদিকেই সব শুখা হোয়ে যায়। ভালই বিয়ে হোয়েছিল মন্জুর। স্বামীর জমিন ছিল ৫ বিঘা, বড়া মকান ছিল, বহেল ভৈস ভি ছিল। ঘরে আটা রোটির কোন অভাব ছিল না। পাক্কা গুসল খানা ভি সুশীল, যওয়ান বিবির জন্যে বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অচানক্ বেমার পড়ে গেল স্বামী সুশীল। তখুন খেতি, জমিন, গাই সব গেল। গাও ছোড়কে মন্জু অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে উঠলো এসে বালী শহরের এই এক কামরাওলা ছোট বাড়ীতে। মন্জু বনে গেল – কামওয়ালী মন্জুয়া। ঘরের কামওয়ালী না, দুসরা ঘরের কামওয়ালী। তো তখন থেকে শুরু হোল ডাব্বা নিয়ে জাঙ্গল সারতে যাওয়া। ভাবে মন্জু, যখন সে এ মাহাল্লায় আসে তখন জমিন কে জমিন বেবাক খালি পড়ে ছিল। বাবুল্ পেড়ু আর সফেদ আক্রার জাঙ্গল শুধু। তারপর তো ধীরে ধীরে জাঙ্গল সাফ হোতে লাগলো। আভি তো খালি জমিন আর কুথাও নাই। মকান বন্ছে সব। তিল, গেহু, জওয়ার কিধার যে হোবে সব। লোকে খাবেই বা কি? দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্জু।

– কেয়া শোচতি বা? ছোট্ট সুর্ভী জিজ্ঞেস করে।

– আওর কেয়া? ভাবছি জমিন সব সাফা হোয়ে গেলে লোকে খাবেই বা কি ইতনা মকান, ইতনা মকান...

– হাঁ , মকান সে টইলিট্ আচ্ছা, ছোট্ট সুর্ভী বলে। তুম দেখা বা আমতাদিদির টনলিট্? ইতনা চমকতা – মুঝে সমঝমে নেই আতা ক্যায়সে আমতাদিদি উধার চলতে। জাটু কি আম্মী উঁহা কাম করতি। ইস লিয়ে জাটু হামেশা যাতে উঁ ঘর। ওহি নে বাতায়ি মুঝে সব কুছ। ম্যায় যব যওয়ান বন্ যায়েগী জাটু কি আম্মী তরা, ম্যায় ভি এইসা এক মকান মে কাম করুঙ্গা যিস্ সে আচ্ছিবালী টইলিট্ হ্যায়। তাকি মুঝকো জাঙ্গল পর নেহি যানা হোগা।

– হাঁ সতী মা ! ইয়ে কেয়া বাতে করতি – যা ভাগ হিঁয়াসে। হাঁকরে ওঠে মন্জু।

নিঃশ্বাস যেন তার বন্ধ হোয়ে যায় সুর্ভীর এসব কথা শুনলে। কামওয়ালী বনবে। তার মতো বদ্ নসিব যেন তার লেড়কা লেড়কির না হয়। তারা পড়ালিখা করবে, জাগদীশকে সে আংরেজী স্কুলে তাই ভর্তি করেছে, নোকরী করবে – এই আশা তার মনে অম্লান শিখায় সবসময় জাগরুক। সুর্ভীর কথা সে শিখায় কাঁপন লাগায়।

মায়ের মূর্তি দেখে সুর্ভী উঠে পড়ে। অভিমানে ঠোঁট ফোলে তার। কামওয়ালী না হয়ে ক্যায়সে ভালো টয়লিট্ পাবে সুর্ভী? অথচ আম্মীকে একথা বললেই আম্মী খেপে যায়। বুড়ি বাতে গাল দেয়। টপ্ টপ্ করে গাল বেয়ে চোখের জল পড়ে সুর্ভীর।

দুদিন সুর্ভী নির্বিবাদেই জাঙ্গল সারে। সেই লোকদুটোর খুব একটা সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

দুদিন বাদে। আকাশে তখনো চাঁদ। শুকতারা ভোরের আকাশে জ্বলজ্বল করছে – মায়ের ধাক্কায় ঘুম ভাঙ্গে সুর্ভীর।

– আরে জলদি করকে উঠ, জাঙ্গল যানা। ও সাফাইঅলা আভি আভি আ যায় লাগতা। মায়ের হ্যাচকা টানে ধড়মড়িয়ে ওঠে সুর্ভী। কিছু ঠিক করে বোঝার আগেই মা হাতে ধরিয়ে দেয় টিনের ডাব্বা। যা জলদি যা। ছুট্। মন্জু আবার ওকে ধাক্কা দেয়। সুর্ভী ঘুম ঘুম চোখে ছুট্ লাগায়। এত ভোরে সে ওঠে না। শীত করছে তার। একটা সুতির কুর্তা তার গায়। চাদরোটা যে কেন আনলো না।

পালতু কুত্তা ভোলা সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে – ভাবখানা যেন ভয় নেই আমিতো আছি।

– রুখ্ আভি রুখ্ বলতে বলতে এক টেম্পো লোক হুড়মুড় হুড়মুড় করতে করতে মাটিতে লাফিয়ে নামে। হাতে তাদের নানা রকমের শাবল, কোদাল, গাঁইতি, দা, করাত। প্রায় সুর্ভীর ঘাড়ের ওপর পড়ে আরকি। সুর্ভী লাফিয়ে সরে যায় একপাশে। ডাব্বাটা ছিটকে পরে দূরে ওর নাগালের বাইরে।

– এই, এইগুলোর জন্যেই সব জমিন গন্ধা হোয়ে গেল। বলে একটা লোক সুর্ভীর দিকে ধেয়ে আসে। সুর্ভী লাফ দিয়ে সরেই ছুটতে শুরু করে। ছুট্ ছুট্। একটা ইঁটের ধারালো কোণায় ওর বুড়ো আঙ্গুলের মাথাটা ছড়ে গিয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে থাকে। দাঁড়িয়ে দেখার সময় পায় না। খানিক ছুটে ভাবে লোকগুলো কি ওর পেছন পেছন এখনো আসছে ? ও থামে একটু। পেছন ফিরে দেখে কেউ আসছে কিনা। না কেউ নেই। বাচ্ গিয়া। এবার সুর্ভী চলতে শুরু করে। দৌড়ায় না। খোঁড়াচ্ছে ও।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ জোরালো আওয়াজে ও আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। দেখে জোরালো মটর লাগানো করাতের আঘাতে বিরাট সবুজ সতেজ বাবুল গাছগুলি তাদের চিকন চিকন পাতা আর বেগনী ফুল গুলো নিয়ে অসহায় ভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

সুর্ভী সেটা দেখে মাটিতে বসে পড়ে নিশ্চুপ হয়ে। পা টা সামনে ছড়িয়ে দেয়।

– লেকিন ওহি পেড় গুলার কি দর্দ লাগে? ক্যা মালুম?

নিজের থেৎলানো রক্তে ভেজা আঙ্গুলটা দেখতে দেখতে সুর্ভী ভাবে।

সুর্ভী গাছে হেলান দিয়ে এবার আরাম করে বসে। ও নিশ্চিন্ত যে লোকগুলো ওকে আর তাড়া করছে না? বসে বেশ আরাম লাগছে তার। এত সকাল সকাল সে কোন দিন উঠে জাঙ্গল সারতে যায় না। শুয়ে কি একটু ঘুমিয়ে নেবে? ভাবে ও। লেকিন এ কোথায় বসে রয়েছে সে? লোকগুলোকে দেখে ওর এতনা ডর লেগে গেছিল। তা বাদ কোন্ দিকে ও ছুট লাগালো তা ওর মালুম পড়ছে না। কিন্তু ও কুনদিকে? কভি তো আয়া নেই ইধার। ভালো করে দেখতে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। আরে সামনে তো এক খন্ডহর। বহুদিন আগের এক ধ্বসে পড়া বাড়ী ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সুর্ভী ভাঙ্গা পাঁচিলের ভেতর দিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়। ভেতরটা মানুষ সমান উঁচু বাবুল গাছে ভর্তি। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

কেয়া বাৎ! হঠাৎ সুর্ভীর মনে খুশীর জোয়ার বয়ে যায়। থ্যাৎলানো পা টা নিয়েই ও প্রাণপনে ছুটতে থাকে বাড়ীর দিকে। ও তার হারানো মানিক খুঁজে পেয়েছে। আম্মীকো আভি আভি ইয়ে খুশ্ খবরি জরুর ভেজনা হোগা। ছুট্ ছুট্। সুর্ভী ছুটতে থাকে।

পকেট

স্বপ্না মিত্র

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পাঁচ-ফুট সাত-ইঞ্চি উচ্চতার শরীরটাকে খুঁটিয়ে দেখছিল উষ্ণা। কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠের মাঝ অবধি নেমে গেছে এক ঢাল ঈষৎ বাদামী রঙের চুল। তার নাক বা চিবুক কোনওটাই খুব তীক্ষ্ণ নয়। তবু সবাই তার মুখশ্রীর প্রশংসা করে, বলে, কী মিষ্টি মুখখানা রে তোর! তবে এক ঢাল চুল বা মিষ্টি মুখশ্রী নয়, উষ্ণার ফিগার নিয়ে ফিদা তার পুরুষ বন্ধুরা।

আয়নার সামনে থেকে সরে উষ্ণা এসে দাঁড়ায় জানলার সামনে। একটা ডিপ ব্রিদ নেয়। পেটটাকে পিঠের দিকে জোরে টেনে ধরে, তারপর ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ে। আবার একটা ডিপ ব্রিদ নেয়, একই প্রক্রিয়ায় ধীরে শ্বাস ছেড়ে দেয় ...

জানলার সামনে থেকে আবার আয়নায় সামনে এসে দাঁড়ায় উষ্ণা। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে তার ঠোঁটে। নিয়মিত যোগব্যায়াম করা শরীর তার। এক তিল অতিরিক্ত মেদ নেই শরীরে কোথাও। সে এমবিএ-র ছাত্রী। যতটা মন দিয়ে সে ম্যানেজমেন্টের মোটা মোটা বইগুলো পড়ে, ততটাই গুরুত্বের সঙ্গে সে শরীরচর্চাও করে। উষ্ণা শরীরচর্চা করে ফিটনেসের জন্য। আর শরীরচর্চার বাইপ্রোডাক্ট তার সুন্দর ফিগার।

তবে তার ফিগার নিয়ে ঋষির আদেখলাপনা আজকাল উষ্ণার মোটেও বরদাস্ত হয় না। ঋষির সঙ্গে তার চেনাজানা কী আজকের? সেই মন্টেসরি থেকে একই স্কুলে, একই ক্লাসে লেখাপড়া করে তারা বড় হয়েছে। দুজনে একসঙ্গে খেলেছে, টিফিন খেয়েছে, দুজনেই প্রত্যক্ষ করেছে পরস্পরের বড় হয়ে ওঠা, পিউবারটি পর্ব।

ঋষিদের আর্থিক অবস্থা ভালো। উচ্চমাধ্যমিকের পর আন্ডারগ্র্যাড করতে ঋষি চলে যায় সিডনি। উষ্ণা ভর্তি হয় কোলকাতার কলেজে। দুজনের মধ্যে তৈরি হয় ভৌগোলিক দূরত্ব। তবে ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপের কারণে তাদের বন্ধুত্ব ফেড-আউট হয়নি, রয়ে গেছে অটুট। আর বেস্ট ফ্রেন্ড থেকে বেস্ট ফ্রেন্ড ফরএভার হওয়ার তাগিদে ঋষি চাকরিতে ঢোকার পর তাদের বন্ধুত্বের রঙের বদল হয়েছে।

শুধু বন্ধুত্বের রঙের বদল তো নয়, উষ্ণা খেয়াল করেছে যে, ইদানীং ঋষির হাবভাবেও অনেক পরিবর্তন এসেছে ...

আগে উষ্ণার ধারালো মুখশ্রীর থেকে উষ্ণার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বেশি প্রশংসা করতো ঋষি। কথায় কথায় বলতো, উফ, কী তাড়াতাড়ি তুই সুডোকু সল্‌ভ করিস রে। কিংবা, ক্রস ওয়ার্ড পাজলে আটকে গেলে ডাক পড়তো উষ্ণার। আন্ডারগ্র্যাডে ইকনমিক্সের সঙ্গে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়েছিল উষ্ণার পরামর্শেই।

সেই ঋষি আজকাল উষ্ণার মতামত, বিচারবুদ্ধিকে পাশে সরিয়ে উষ্ণার পার্ফেক্ট ফিগার নিয়ে অতিরিক্ত কথা বলে। যখন তখন উষ্ণার তলপেটে হাত রাখে। বলে, "উফ, তুই যে কী অসম্ভব সুন্দর! পনেরো বছর বয়স থেকেই তোর তলপেট এত ইনভাইটিং!" উত্তরে উষ্ণা হাসে। শৈশবের বন্ধু ঋষিকে বলে, "বুদ্ধু কাহাকার। প্রেমিকার চুল বা চোখের প্রশংসা করতে হয়। তলপেটের প্রশংসায় কাম রিপুর গন্ধ ভাসে, সেটা জানিস না? সবই শিখিয়ে দিতে হবে?"

চোখের কোণে সবজান্তার হাসি হাসে ঋষি। বলে, "আই অ্যাম অনেস্ট উষ্ণা।"

চেঁচিয়ে ওঠে উষ্ণা, "অনেস্টির নিকুচি করেছে! খুব পেকেছিস, না? পনেরো বছর বয়সের কথা মনে আছে তোর? তখন তো সারাদিন বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে বসে থাকতিস। আন্টিকে মাছের কাঁটা অবধি বেছে দিতে হত। সেই ছেলের মুখে এখন কত বড় বড় কথা!"

উষ্ণার কোমরের খাঁজে আলতো ঠোঁট ছোঁয়ায় ঋষি। বলে, "মাই অনেস্ট কনফেশন বেবি। তোর ফেসিয়াল বিউটি মাঝারি, বাট ফিগার মারকাটারি।"

আয়নার থেকে চোখ ফিরিয়ে পূব দিকের দেওয়াল বরাবর স্টাডি টেবিলটার দিকে তাকালো উষ্ণা। টেবিলের উপর রাখা একটা প্যাকেট। প্যাকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে নরম ল্যাভেন্ডার রঙের লং-ড্রেসটা।

বডি হাগিং, গলা থেকে পা অবধি টানা লম্বা পোশাক, হাঁটুর দু-ইঞ্চি উপর থেকে সাইড স্লিট।

এই ধরণের লং-ড্রেস যে উষ্ণা পছন্দ করে না বা পরে না এমন তো নয়। কিন্তু এই ড্রেসটাকে কেন্দ্র করে আজ শপিং-মলে এত কথা হল! কথাগুলো পুনরায় মনে ভেসে উঠতেই উষ্ণার ভিতরটা ধকধক করে ওঠে। তার চোখের আলোয় আগুন রঙের আভা। মনে মনে ভাবল, বেটার লেট দ্যান নেভার। ঋষির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তার আরও সময় নিয়ে ভেবে দেখা উচিত। অথবা উষ্ণার নিজেকেই হয়তো নতুন ছাঁচে ফেলে তৈরি শুরু করা দরকার!

সামনের সপ্তাহে উষ্ণার জন্মদিন। সেই উপলক্ষে আজ ঋষি আর সে গিয়েছিল শপিং-মলে। ঋষির সঙ্গে উষ্ণার শপিং-মলে যাওয়া, ঘুরে ঘুরে বাজার করা নতুন কিছু নয়। আজও শপিং-মলে পৌঁছে সে তার নিজের মত ঢুকে পড়েছিল পোশাকের দোকানে। আর ঋষি ঢুকেছিল মিউজিক স্টোরে।

অনেক ঘেঁটে বেছে ট্রায়ালের পর উষ্ণার যে শার্টটা পছন্দ হয়েছিল, তাতে দুটো বুকপকেট আর প্যান্টেও একটা সাইড পকেট ছিল। প্যান্টের পকেটটা বেশ বড়সড়, অনায়াসেই মোবাইল ফোন এবং দু-চারটে কাগজ ধরে যায়।

মিউজিক স্টোর থেকে বেরিয়ে কখন যে ঋষি এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল উষ্ণা তা টেরই পায়নি।

উষ্ণার হাতে ধরা শার্টটার দিকে তাকিয়ে ঋষি বলল, "ব্রাউন। বাট ব্রাউন ডাজন্ট স্যুট ইউ। নীল রং তোর উপর বেশি ভালো যায়। তোকে মানায় বেশি।"

এই যে ঋষি খেয়াল করে উষ্ণার টুকিটাকি, ছোট ছোট ডিটেইলস, এইজন্যই তো সে ঋষিকে এত্ত ভালোবাসে।

মাথাটা এক পাশে হেলিয়ে, গলায় অনেকখানি আহ্লাদ ঢেলে উষ্ণা জিজ্ঞাসা করেছিল, "নীল রং? মানে আকাশ নীল? সিডনি থেকে কেনা তোর দেওয়া স্কার্ফটার মত?"

কাঁধ ঝাঁকায় ঋষি, "ইয়েস। আকাশ নীল বা প্রুসিয়ান ব্লু। অর এনি শেড অফ ব্লু। নীল হলেই চলবে।" ঋষির বাঁ-হাতটা নিজের ডান-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল উষ্ণা। বলেছিল, "জো হুকুম শাহজাদা।"

ঋষির হাত ধরে শার্টের আইলের দিকেই যাচ্ছিল উষ্ণা। হঠাৎ তার হাত ছাড়িয়ে লং-ড্রেসের আইলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ঋষি। প্যান্টের দু-পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়ায়। বলে, "শার্টের দরকার নেই। অনেক আছে তোর। একটা লং-ড্রেস নে তো।"

লং ড্রেস! উষ্ণার চোখে দ্বিধা। সে বলে, "কিন্তু আমার যে নতুন শার্ট দরকার। নেক্সট-উইক কলেজে গ্রুপ ডিসকাশন আছে।"

ঋষির স্বরে হঠাৎই কর্তৃত্বের ছোঁয়া, "দেন টেক সামথিং এলিগেন্ট। পকেটওয়ালা শার্ট নয়। চুজ সামথিং মোর ফেমিনিন।"

ঋষির কথার ধরণ দেখে উষ্ণা বিস্মিত হয়। সে জিজ্ঞাসা করে, "কেন? পকেট দেওয়া শার্ট নয় কেন? পকেট দেওয়া শার্ট পরলে মেয়েদের কমনীয়তা কি কম হয়ে যায়?"

উষ্ণার প্রশ্নে ঋষি মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েছিল। তবে পর মুহূর্তেই ঠাট্টার সুরে বলে, "ইয়েস। তাছাড়া, মেয়েদের পোশাকে পকেট তো শো-পিস।"

ভুরু কুঁচকে ওঠে উষ্ণার। ঝাঁজালো স্বরে বলে, "হ্যাঁ, ডিজাইনারদের ডিজাইন মতোই তো পোশাক তৈরি হয়। আর অধিকাংশ ডিজাইনারই তো তোর মত পুরুষ। তারা মেয়েদের পোশাকে ঢাউস পকেট রাখেন না।"

উষ্ণার গলার ঝাঁজ অবশ্য ঋষিকে স্পর্শ করে না। সে দাঁত বের করে হাসে। বলে, "রাইট। পুরুষ ব্যস্ত তার কাজ নিয়ে আর মহিলারা তাদের লুকস নিয়ে। মার্কেটের ডিম্যান্ড অনুযায়ীই তো ডিজাইনাররা ডিজাইন করেন।" এবার উষ্ণা ঘুরে তাকায় ঋষির দিকে। চোখ কুঁচকে বলে, "তাই?"

ঋষি পার্স, মোবাইল ফোন, চশমার খাপ, আরও দু-চারটে কাগজ রাখার কারণে ফুলে থাকা প্যান্টের পকেটের ওপর হাত রেখে মুখের হাসি আরও প্রশস্ত করে। বলে, "তোরা সেজেগুজে বেরোনোর সময় ঢাউস ব্যাগ নয়, দর্শন ধারী এইটুকু ব্যাগ নিয়ে যাস সঙ্গে। বরের হাত ধরে সব স্বর্ণলতা তখন। ক্রেডিট-কার্ড টু বাড়ির-চাবি সবই বরের পকেটে। যতক্ষণ ছেলেদের কাছে পকেট আছে ততক্ষণ স্বর্ণলতা হয়ে ঝুলে থাকাই মেয়েদের ভবিতব্য, বুঝলি? তাছাড়া তোর ফিগারে লং-ড্রেসটা দারুণ মানাবে রে। ফিনিশ কুইকলি। ড্রেসটা নিয়ে নে।"

ঋষির কথায় চিড়বিড় করে ওঠে উষ্ণা। সে চারপাশে তাকায়। তবে সামনে-পিছনে গিজগিজে ভিড় দেখে আর কথা বাড়ায় না। তবে মনে মনে ভাবে, মেয়েরা নিজেদের লুকস নিয়ে ব্যস্ত, তাই না? ডাহা মিথ্যে। ছেলেরা ব্যস্ত মেয়েদের সৌন্দর্য নিয়ে। পুরুষ শুধু নারীর রূপই বোঝে। একজন পুরুষের কাছে নারী প্রথমে শো-পিস, তারপর তার অন্য গুণাবলী।

কী মনে হয় উষ্ণার, সে আয়নার সামনে থেকে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। প্যাকেট থেকে ল্যাভেন্ডার রঙের লং-ড্রেসটা বের করে ঝটপট গলিয়ে নেয় শরীরে।

আবার আয়নার সামনে ফিরে আসে। দু-হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পরখ করে নিজের শরীর। গলা থেকে বুকের ঢাল বেয়ে কোমরের বাঁকে এসে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়ায়। মনে পড়ে যায় মা-র মুখে শোনা একটা ঘটনা।

উষ্ণার মা সুমিতা কোলকাতার মেয়ে নন। বড় হয়েছেন এক ছোট্ট মফঃস্বল শহরে। সুমিতার তখন ক্লাস ফোর, ন-বছর বয়স। আর সুমিতার ভাই ছ-বছরের, ক্লাস ওয়ান। মফঃস্বলে সুমিতাদের স্কুল ছিল কো-এড। ভাই আর বোন একই স্কুলে পড়তেন।

গরমের ছুটি পড়ার দিন সুমিতাদের স্কুলে খুব হইচই হতো। শুধুই মজা। অঙ্ক ভুল হওয়ার ভয় নেই। হাতের লেখা খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। কোন লেখাপড়াই নেই তো। সেদিন স্কুলে স্কুল-ড্রেস পরে যাওয়ার কড়াকড়ি নিয়মও থাকতো না। যে যার ইচ্ছেমত সেজেগুজে স্কুলে যাও। সেদিন স্কুল করিডরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত এক ঝাঁক রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়াতো যেন।

সবচাইতে মজার ছিল স্কুল ফাংশন-হলে গেস্ট আর্টিস্টদের অনুষ্ঠান। প্রতি বছর নতুন নতুন আর্টিস্ট, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের প্রোগ্রাম। তবে টিকিট কেটে দেখতে হত সেই অনুষ্ঠান। সেবছর ছিল প্রথমে পুতুল নাচ, শেষে ম্যাজিক-শো। সুমিতা আর তার ভাই, দুজনের দুটো টিকিট।

ম্যাজিক-শো দেখার উত্তেজনায় রাতে সুমিতার ভালো করে ঘুম হয়নি। সকালে সে তার প্রিয় গোলাপি রঙের ফ্রক পরে, গোলাপি রঙের রিবন চুলে বেঁধে, নিউকাট জুতো পরে স্কুলে গেছে ...

সুমিতার ফ্রকে পকেট নেই। সঙ্গে স্কুল ব্যাগও নেই। তাই দুটো টিকিটই ভাঁজ করে রাখা আছে ভাইয়ের পকেটে।

ক্লাস-টিচার অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার পর বন্ধুদের সঙ্গে হুড়োহুড়িতে মেতে ছিলেন সুমিতা। প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার হুইসল বাজতেই বন্ধুদের সঙ্গে সে পৌঁছে গিয়েছিল ফাংশন হলের প্রবেশ দরজার সামনে। প্রবেশ দরজার সামনে ভাইয়ের অপেক্ষা করার কথা।

তবে ফাংশন হলের সামনে পৌঁছে সুমিতা অবাক। চারপাশ দেখে, কোথাও তার ভাই নেই! এদিকে টিকিট তো ভাইয়ের পকেটে। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। তবু ভাইয়ের আর দেখা নেই। সুমিতার বন্ধুরাও তার হাত ছেড়ে ফাংশন হলে ঢুকে পড়েছে। প্রিয় গোলাপি রঙের সিল্কের ফ্রক গায়ে সুমিতার তখন কাঁদোকাঁদো অবস্থা।

হঠাৎ হলের ভিতর থেকে সুমিতার এক বন্ধু চেঁচিয়ে ডাকে, "অ্যাই সুমিতা, এই তো তোর ভাই, আমাদের সামনে বসে।"

সুমিতা যেন হাতে আকাশের চাঁদ পায়। সে ফাংশন হলের ভিতর মুখ বাড়িয়ে ডাক দেয়, "অ্যাই ভাই, আমার টিকিট কোথায়? টিকিটটা দে। টিকিট ছাড়া ভিতরে ঢুকবো কী করে?"

ছ-বছর বয়সের ভাই রিনরিনে গলায় উত্তর দেয়, "দুটো টিকিটই গেটে দিয়ে দিয়েছি তো।"

সেদিন সুমিতার আর ম্যাজিক দেখা হয়নি। সে একা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এসেছিল। বাড়িতে এসেও তার কান্না আর থামে না। সুমিতার ফ্যাচফ্যাচানিতে বিরক্ত হয়ে উষ্ণার দিদিমা নাকি মেয়েকে এক চড় মেরে বলেছিলেন, "ফ্রিল দেওয়া ফ্রক নয়। এইবার পুজোয় পকেট লাগানো জামা দেব। সামনের বছর ম্যাজিক শোয়ের নিজের টিকিট নিজের কাছে রেখো, বুঝলে?"

প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো ঘটনা। অনেকদিন হল উষ্ণার দিদিমা ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন।

উষ্ণার মা সুমিতা কি বুঝেছিলেন পকেটের গুরুত্ব? পকেটের মহিমা?

এযুগের উষ্ণা কিন্তু অনেকটাই বুঝছে, মানে বুঝতে পারছে, বুঝতে শিখছে আর কী।

উষ্ণার কাছে এখন দুটো অপশন...

এক, পকেট বিহীন লং-ড্রেসে সুন্দর শো-পিস হয়ে শো-কেসের জীবন।

দুই, একটা পকেট যুক্ত পোশাক। যে পকেটে এটিএম-কার্ড থেকে বাড়ির চাবি, দু-চারটে প্রয়োজনীয় বিলও সঙ্গে রাখা যায়।

এই হিংসা, দ্বেষ, রোগভোগের পৃথিবীতে সুস্থ শরীরে ভালোবাসার মানুষদের নিয়ে বেঁচে থাকা আর প্রেমময় দিনযাপন তো ম্যাজিক সম। আর ম্যাজিক শোয়ের টিকিট হাতব্যাগেও নয়, রাখতে হয় নিজের পকেটে।

কারণ ম্যাজিক শোয়ের টিকিট কাছ ছাড়া হয়ে গেলে কত শত আনন্দই যে হাত ছাড়া হয়ে যায়...

লঙ ড্রাইভ

রমা সিনহা বড়াল

আজ ছুটির দিন। ঠিক করেছিলাম দেরি করে উঠবো। এমন সময় মিমির ফোন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই রেডি হয়ে নে। টিনা, রুনা তুই আর আমি – লং ড্রাইভে যাবো। জলদি রেডি হয়ে নে। পনেরো মিনিটে তোর বাড়ি আসছি। মিমি ঐরকম। ওর নতুন গাড়িটি দারুণ। একদম পরিবেশ বান্ধব। সবচেয়ে মজার হল মিমি আর টিনাকে দেখে বোঝাই যায় না ওরাও অর্থাৎ artificial intelligence দুটো মানুষ। একদম হুবহু আমার মতো – ঘুরতে, হৈ হৈ করতে খুব ভালবাসে। বলতে বলতে মিমির ইলেকট্রিক কার কাম হেলিকপ্টার হেলিকার "super Nova 2024" দরজাতে এসে হাজির।

মিমি আর টিনা এসেই মাকে বললো – "মাসিমা দম নেবো।" মা ওদের জানে তাই energy store করার জন্য charger cabinet খুলে দিল। ওরা চার্জড হতে গেল। রুনা আর আমি – মায়ের হাতে করা গরম গরম আলু পরোটা খেয়ে, মহা খুশী হয়ে মা'কে আদর করে দিলাম। মা বলে দিল – "সাবধানে যাবে, কাল সন্ধ্যার মধ্যে সবাই ফিরে আসবে। আর নিজেদের কোন ঝামেলাতে জড়াবে না।" Good girl এর মতো মাথা নেড়ে হৈ হৈ করে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম।

রাস্তায় নেমে মিমি বললো – কিরে গাড়ি না কপ্টার? লং ড্রাইভে গেলে গাড়িই আমরা বেশি পছন্দ করি। চারপাশের দৃশ্য বেশ দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। অনেক মানুষের সাথে পরিচয় করা যায়।

হাইওয়েতে এসে মিমির প্রশ্ন – কিরে দিল্লী রোড না মুম্বাই রোড?

ক'দিন আগে মুম্বাই রোড দিয়ে ঘুরে এসেছি। তাই দিল্লী রোড তথা দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েই ধরা হলো। মিমি গাড়ি নিয়ে বেরোলে কাউকে স্টিয়ারিং ধরতে দেয় না। তার একটা কারণ আছে। ও যখনই রাস্তায় যানজট দেখে – গাড়িটা চট করে কপ্টারে বদলে ফেলে। যানজটের মধ্যে গাড়ি চালাতে পছন্দ করে না। এদিকে পথচলতি মানুষেরা চারচাকার গাড়ি হঠাৎই হেলিকপ্টার হয়ে গেল দেখে ভিড় জমিয়ে দেয়। চারিদিক – গাড়ি, মানুষের ভিড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে বেহাল হয়। ডানকুনির মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ দৌড়ে আসে। কিন্তু মিমি তাকে টা-টা করে আকাশ পথে আরও একটু উড়ে প্রায় তারকেশ্বরের ফ্লাইওভারের রাস্তায় পৌঁছে কপ্টারটাকে গাড়ি করে ফেলে। পুরো রাস্তায় শয়ে শয়ে মহিলা পুরুষ বাঁক কাঁধে নিয়ে – "জয় বাবা ভোলেনাথ", "জয় বাবা তারকনাথ" বলতে বলতে তারকেশ্বরের মন্দিরের দিকে দৌড়াচ্ছে। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেই এইভাবে হাইওয়ে বন্ধ করে মানুষের ধর্ম আচরণ সম্ভব। শ্রাবণ মাসে এটা তো ঘটবেই। এরজন্য যথার্থ পথ পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল। হাইওয়ে করার সময় এটা চিন্তা করা উচিত ছিল। হাইওয়ে নীচ (underpass) দিয়ে পায়ে হেঁটে পথচলা ব্যবস্হা রাখা উচিত ছিল।

আরো এগিয়ে চললাম। রাস্তার দু'ধারে সবুজ ক্ষেত। মাঠে অনেক লোক কাজ করছে। ছোট ছোট লরি দাঁড়িয়ে। আবার দ্রুত গতির গাড়ি রাস্তার গতি কমিয়ে দিয়েছে। মিমি বলে – লাল বস্তা ওগুলো কি? আলুর বস্তা। ক্ষেত থেকে আলু তুলে বস্তা বন্দী করে হিমঘর নিয়ে যাচ্ছে। মিমি গাড়ি থামিয়ে নেমে যায়। দেখি একজন রোগা বয়স্ক লোককে বিশাল এক আলুর বস্তা টেম্পোতে তুলতে সাহায্য করছে। লোকটি ও আশেপাশের সকলে এমন কান্ড দেখে অবাক হয়ে গেছে। ওরা তো জানেনা মিমি একজন রোবট। গায়ে অনেক শক্তি!

খানিকক্ষণ-এর মধ্যে আসানসোল পৌঁছলাম। মিমি বললো – জায়গাটা কি রুক্ষ রে! গাছপালা কম, কিরকম শুকনো, রোগা লোকের মতো চেহারা। এখানে মানুষ তো শ্বাসকষ্টতে ভুগবে। বললাম ঠিকই বলেছিস। আর একটু পরে খনি অঞ্চল। এখানকার মানুষজন শ্বাস কষ্টে ভোগে। রাণীগঞ্জ, কুলটি, ধানবাদ ইত্যাদি কয়লা খনি অঞ্চল। সব মাফিয়াদের রাজত্ব। দুই রোবট কন্যা খুব উত্তেজিত হয়ে তাদের মুখোমুখি হতে চাইলো। বলতে বলতে চারজন মাস্তান গাড়ির রাস্তা আটকে দাঁড়াল। "আমাদের দশ হাজার টাকার চাঁদাটা দিয়ে যান।"

মিমি বলে – "কিসের চাঁদা ?"

গলায় রুমাল বাঁধা গুন্ডা বলে – "আমার এলাকাতে ঢুকেছো এন্ট্রি ফি দেবে না মামনি"?

মিমি আর টিনা আমাদের গাড়ি লক করে বসতে বলে গাড়ি থেকে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে নামে। বলে –

"হাতের সুখটা করে নি, তারপর ফি দেবো।"

গুন্ডাগুলো কিছু বোঝার আগেই দু'তিনটে জব্বর ঘুষি খেয়ে চারজনেই ছিটকে পড়লো। ওরা কল্পনাও করতে পারে নি দু'টি মহিলা তাদের মেরে শুইয়ে দেবে। রাগে গরগর করতে করতে গা ঝেড়ে উঠে তারা আবার বন্দুক নিয়ে মিমিদের আক্রমণ করতে গেলে, মিমিরা তাদের মাথার উপর তুলে দু'পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। বাকি দু'জন তা দেখেই দৌড় দিয়ে পালালো।

মিমি গাড়িতে এসে বসে হো হো করে হাসলো। বললো বাঙালি মেয়েরা বড়ো দুর্বল, গায়ে জোর কম। তাই এই গুন্ডারা সবাইকে ভয় দেখায়। কাল থেকে আমি তোদের ক্যারাটে শেখানো শুরু করবো। চারিদিকে এতো সব আদিম চরিত্রের মানুষের বাস, তাদের মোকাবেলা করতে হলে, এই বিদ্যা জানা খুব জরুরি। আবার আমাদের চলা শুরু হলো। নানা রকম গল্প করতে করতে চলেছি। গাড়িতে গান চলছিল। হঠাৎ গান থামিয়ে, ঘোষক ঘোষণা করলো – কলকাতার এক সরকারি হাসপাতালে এক প্রতিশ্রুতিময়ী জুনিয়র মহিলা ডাক্তার কে নৃশংস ভাবে অত্যাচার করে, খুন করা হয়েছে। মিমি চট করে গাড়িকে হেলিকপ্টারে বদল করে কলকাতার দিকে রওনা হলো। আধঘণ্টার মধ্যে আমরা হসপিটালে পৌঁছে গেলাম। হেলিকপ্টারকে গাড়িতে বদল করে পার্ক করা হলো। মিমি কোন মহিলার বিপদ হলে স্হির থাকতে পারে না। ও ওর অনুভূতি দিয়ে অনুভব করতে পারে কে দোষী। উপরে উঠে সোজা সেই মূল অপরাধীর ঘরে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে একতলার মাঠে নিয়ে আসে। টিনাকে বাকি চারজনের নাম বলে ধরে আনতে বলে। সবাই কে বেধরক পেটাতে থাকে। চারিদিকে হসপিটালের লোকজন ভীড় করে আসে। যারা দোষী তারা এদের রক্ষা করতে ছুটে আসে। সাথে সাথে টিনা বোঝে এরাই আসল দুষ্কৃতী। সবাইকে একসাথে ধরে বেঁধে ফেলে।

ইতিমধ্যে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে যায়। কমিশনার সাহেব এসে মিমিকে দেখে চিনতে পারেন। এর আগেও মিমি দুষ্কৃতী ধরতে পুলিশকে সাহায্য করেছে। তাই কমিশনার তার ওপর ভরসা রাখেন। সময় মতো আসার জন্য ও দুষ্কৃতী ধরার জন্য মিমিকে ধন্যবাদ দেন। ধন্য রাজ্যের পুলিশ!! কি কর্মদক্ষতা!! কোন কাজ নিজে করার ক্ষমতা নেই। প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতায় নিজেদের শিরদাঁড়াটাই বাঁকিয়ে ফেলেছে।

চারপাশের ভীড় এড়িয়ে মিমি, টিনা গাড়িতে চলে আসে। কলেজ চত্বরে তখন অনেক ছেলে মেয়ের ভীড়। তারা সবাই এই অন্যায়ের বিচার চেয়ে স্লোগান দিচ্ছে এবং অবস্হান ধর্মঘট করেছে। জানতে পারলাম ডাক্তারদের মতো প্রফেশনেও টাকা নিয়ে নম্বর বাড়িয়ে অযোগ্য ছেলে মেয়েদের পাশ করানো হচ্ছে। এর আগে শিক্ষা দপ্তরে লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে অনেক অযোগ্য লোকেদের চাকরি দেওয়া হয়েছে।

মিমি বলে – এসব কি হচ্ছে? একটা গোটা প্রজন্মকে তো শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসন কি কিছুই জানেনা? পুরো ঘটনাগুলো বিচারাধীন। তাই কোন মন্তব্য না করাই ভাল।

এইসব আলোচনা করতে করতে আমরা রওনা দিই বাড়ির দিকে। ইতিমধ্যে টিভির কৃপায় মা সব জানতে পেরেছেন। ফোনে বকতে শুরু করলেন "আবার ঝামেলা করেছিস? তোদের নিয়ে আর পারলাম না। এক্ষুনি বাড়ি চলে এসো"। ভাল মেয়ের মতো আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

লঙ ড্রাইভ মন্দ হলো না। এবার কি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন রোবটের সাহায্য নিয়ে আমাদের জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবার চেষ্টা করতে হবে ?

অপলা ফার্মাসিউটিকল

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

তখন সবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছি জলপাইগুড়ি থেকে। ছিয়ানব্বই সাল। বামফ্রন্ট আমল। সার্টিফিকেট নিয়ে কলেজ ও হোস্টেল জীবন কাটিয়ে ফের হিন্দমোটরে নিজের বাড়িতে ফিরতে হলো। কিন্তু ফিরলেই তো হলো না, চার বছর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পর চাকরি যোগাড় করতে গিয়ে জুতোর শুকতলা খুইয়ে ফেলার উপক্রম। সকাল থেকে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে অফিসে অফিসে বায়োডাটা জমা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে শেষে বিকেলে বাড়ি ফিরে আসতাম। শিয়ালদা স্টেশনের পাশে পাইস হোটেলে কোনো কোনো দিন দুপুরে লাঞ্চ করা হয়ে উঠতো না। ফিরতি ট্রেনে ঘেমে নেয়ে মনে হতো এই কি জীবন কালি'দা? বাবা ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে ভালো জায়গায় কাজ করতেন। একদিন ডেকে বললেন "এত তো ঘুরলি কিছু হলো না, আমার অফিসের ডিরেক্টরকে কি তোর কথা বলবো ?"

বাঙালের ছেলে, আত্মসম্মানবোধ বেশী। সটান বাবার মুখের ওপর বলে দিলাম "না"। ঈষৎ ক্ষুণ্ন হয়ে বাবা বললেন "যা ভালো বুঝিস কর"। সেদিন রোববার, বাড়িতে ছোটমামা এসেছিল চকদীঘি থেকে। তারকেশ্বর পেরিয়ে গাঁ উজিয়ে চকদীঘি গ্রামের মামাবাড়িতে থাকলে কি হবে ছোটমামার কানেকশন ছিল অনেক দূর পর্যন্ত। সব শুনে বললো "শোন, গোঁ ধরে থাকা ভালো না, বড়বাজারে অপলা ফার্মাসিউটিকলের মালিক ধনপত রাউত আমার পরিচিত, ওকে বলে রাখছি পরশু গিয়ে দেখা করবি"। নিমরাজি হয়ে বললাম "বেশ"।

মঙ্গলবার সক্কাল সক্কাল বেরোলাম। বেরোনোর সময় যথারীতি মা'র দুগ্গা দুগ্গা বলা। গলার টাইয়ের নট ঠিক করে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললাম "ভূত ভগবানে বিশ্বাস করে কিছু হয়না"। পিছন থেকে শুনলাম "বেশী কথা তোর"। হাওড়া থেকে এসপ্লানেডের মিনিবাসে করে টি-বোর্ডের অফিসের সামনে নেমে বাঁহাতে একটু এগিয়ে গেলে রাধাবাজার স্ট্রিটে তিনতলায় অপলা ফার্মার অফিস। রিসেপশনে নিজের পরিচয় দিতে অফিসের বেয়ারা বললো "বয়ঠিয়ে"।

সাদামাটা পুরোনো অফিস, খান কয়েক কাঠের টেবিল চেয়ার, পলেস্তারা খসে ইলেকট্রিকের ওয়ারিং ঝুলে আছে, সাফ সুতরো বিশেষ হয় বলে মনে হলো না। মিনিট পনের পর বেয়ারা এসে বললো "যাইয়ে"। বাঁ দিকের হলুদ রংচটা কাঠের দরজা ঠেলে "মে আই ..." বলার আগেই ধনপতজী বলে উঠলেন "আরে আইয়ে আইয়ে চক্রবর্তী সাব"। সাদা পাঞ্জাবি, কপালে হলুদ তিলক, পাশে পানের ডিব্বা, ছাপ মার্কা মারোয়ারী ব্যবসাদার। "স্যার বায়োডাটা ..." বলার সাথে সাথে ধনপতজী বললেন "আরে কুছু লাগবে না, আপকা মামাজি কে সাথ কোথা হয়ে গেছে, আপনি কাল সে কাজে জয়েন কিজিয়ে"। আমতা আমতা করে বললাম "কাল ? মানে কি কাজ করতে হবে যদি একটু ...?" থুক করে পানের পিক ডিব্বাতে ফেলে ধনপতজী বললেন "কাম হ্যায় মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ কা, সমঝে না? ছাপড়া কা নাম শুনা হুয়া তো?" মাথা নেড়ে জানালাম হ্যাঁ। বিহারের ছাপড়ার নাম কে না জানে। ধনপতজী বললেন "ছাপড়া মে হামারা ফেক্টারি আছে, ক্যাপসুল, সিরাপ, দাওয়াই বগেড়া, হাম কলকাত্তামে ইয়ে সভি ইমপোর্ট করকে গাঁও গাঁও মে বেচতে হ্যায়।" বুঝলাম বেশ দৌড় ঝাঁপের কাজ কিন্তু ছাপড়াতে ওষুধের ফ্যাক্টারি আছে কখনো তো শুনিনি। ধনপতজী বলে চললেন "জিন্দেগী মে হোনেষ্টি বহুত জরুরি, ইয়ে কোম্পানি মেরা মাতাজীকা নাম মে বানায়া"। মাথায় হাত দিয়ে চোখ বুঁজে নমস্কার করে বললেন "অপলারানী রাউত, মেরা মাতাজী"। থাকতে না পেরে বললাম "তো স্যার ইয়ে মানে স্যালারী"। ধনপতজী আমাকে প্রায় থামিয়ে দিয়ে বললেন "আরে সেলারি লে কে শোচিয়ে মত, আচ্ছা কাম হোগা সেলারি ভি আচ্ছা হোগা, অউর আপ তো বিমলজীকা নেফিউ"। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি ছোটমামার ভালো নাম বিমলেন্দু কিন্তু লোকে বিমল বলে জানে।

ধনপতজী সামনের টেবিলে রাখা বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বললেন "অবিনাশজীকে সাথ ইনকো মুলাকাত করাইয়ে।" পাশের রুমে যেতে হলো। শীর্ণকায় এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক জাবদা খাতায় মুখ গুঁজে লিখে চলেছেন। বেয়ারা পরিচয় করিয়ে দিলো। অবিনাশ কর্মকার। অনেক দিনই এই অফিসে আছেন। ব্যাকব্রাশ সাদা চুল, সস্তার ছিটের জামা। অফিসের কাগজপত্র, ট্যাক্সের খাতা সব সামলান। মোটামুটি কাজ বুঝিয়ে দিলেন। সকালে এসে ওনার কাছ থেকে ওষুধের ফাইল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে, মূলতঃ ডাক্তারদের চেম্বারে। গিয়ে ওষুধ গছাতে হবে, সাথে কিছু ফ্রি গিফট, ক্যালেন্ডার, পেন চামড়ার ডাইরি এইসব। বেশ ইন্টারেস্টিং কাজ। বেয়ারা চা দিয়ে গেছিলো আমাদেরকে। চুমুক দিয়ে বললাম "ভালোই হলো এবার থেকে অসুখ হলে নিজের কোম্পানীর ওষুধ খাবো"। মুখ তুলে মোটা ফ্রেমের চশমার মধ্যে দিয়ে হিমশীতল চোখে বললেন "পাগল না কি মাথা খারাপ? মরার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি?" খাতায় মুখ গুঁজে লিখতে লিখতে বললেন "কাল থেকে শুরু করে দিন, দেখুন কেমন লাগে, কেউ তো বেশী দিন টেঁকে না এখানে"। থতমত খেয়ে বললাম "ওহ"।

যাই হোক, পরের দিন জয়েনিং। সকালে খাবার খেয়ে সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট আর চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে বেরোতে যাবো অমনি এক চামচ টক দই এগিয়ে দিয়ে মা বললো "শুভ দিনে একটু মুখে দিতে হয়"। বিনা বাক্যব্যয়ে খেয়েই দৌড়, পৌনে ন'টার ডাউন লোকাল মিস হয়ে গেলে অফিস পৌঁছতে পারবো না ঠিক সময়ে। এবার কাজের ব্যাপারে আসি। মন্দ লাগছিলো না। বর্ধমান অব্দি মান্থলী কাটা থাকতো। ট্রেনে বাসে ঘুরে ঘুরে হুগলি, বর্ধমানের ছোট ছোট শহর আর গ্রাম গঞ্জে ওষুধ বেচা আর বিকেলে অফিস ফিরে অবিনাশ বাবুকে হিসেব দেয়া। প্রতিদিন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা খুব একটা খারাপ লাগতো না। চলছিলো বেশ কিন্তু সপ্তাহ তিনেক পরে যেটা হলো তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

সেদিন যেতে হয়েছিলো দেবিপুর। পান্ডুয়া আর মেমারির মাঝামাঝি এক ছোট জায়গা। হাওড়া থেকে বর্ধমান লোকালে দেবিপুর পৌঁছাতে লেগে গেল প্রায় দেড় ঘন্টা। মাঝে ব্যান্ডেলে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো ট্রেনটা। দেবিপুর স্টেশনে নেমে ওভার ব্রিজ দিয়ে লাইন পেরোতো পেরোতো দেখলাম ঘড়িতে প্রায় দুপুর বারোটা। সাতগাছিয়া রোডের ওপর ব্যানার্জি মেডিকেল স্টোর। দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে হাঁপাচ্ছি, দেখি স্টোরের কাউন্টার থেকে একজন মুখ উঁচু করে কর্কশ গলায় বললেন "আপনার তো এগারোটায় আসার কথা"। বুঝলাম মালিক। ট্রেন লেট বলে ম্যানেজ করে লাল নীল সিরাপের বোতল তুলে দিচ্ছি হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন "বিকেলের আগেই ফিরছেন তো?" বললাম "হ্যাঁ ফিরতে হবে"। ভদ্রলোক অদ্ভুত স্বরে গলা নামিয়ে বললেন "বেশ, বেশ, আসলে দিনকাল তো খুব ভালো না"।

কিছুই মাথায় ঢুকলো না। পেমেন্ট নিয়ে আবার দৌড়ালাম। একটু এগিয়ে সাতগাছিয়া রোডের ওপর ঘোষ মেডিকেল। দু ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে রাংতা মোড়া ট্যাবলেটের পাতা গুলো দোকানে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলাম "আচ্ছা ডক্টর অর্ক বৈদ্য কি আছেন?" দোকানের ছেলেটা বললো "না ডাক্তারবাবু ছুটিতে গিছেন"। একটু হতাশ হলাম। পটিয়ে পাটিয়ে নতুন ওষুধ গছানোটা ভেস্তে গেল। হঠাৎ দোকানের ছেলেটা মুখের দিকে চেয়ে বললো "কলকাতা থেকে এয়েচেন, ফিচ্চেন তো বিকেলে?" অবাক হয়ে বললাম "হ্যাঁ ফিরতে তো হবেই"। ছেলেটি ক্যাশ গুনে আমার হাতে দিতে দিতে বললো "সেটাই ভালো বুইলেন, দিনকাল তো ভালো না"। দোকান থেকে বেরিয়ে একটু খটকা লাগলো। সবাই আমার ফেরার কথা জিজ্ঞেস করছে কেনো।

যাই হোক কিছু দূর এসে স্টেট ব্যাংকের সামনে চায়ের দোকানে চায়ের অর্ডার দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম "অরূপ ডাক্তারের ডিসপেনসারি কোন দিকে বলতে পারেন?" ডাইনে গিয়ে বাঁয়ে আর বাঁয়ে গিয়ে ডাইনে শুনে মনে হলো এর চেয়ে নিজে খুঁজে দেখা ভালো। ডাক্তার অরূপ ঘোষের নাম অবিনাশবাবু বিশেষ করে বলেছিলেন, আমাদের ওষুধ নিয়মিত নেন কি না তাই। চা শেষ করে হাঁটা দিলাম। একে ওকে তাকে জিজ্ঞেস করে করে সংহতি পাড়ার দুর্গা মন্দির

পেরিয়ে অবশেষে দেখা মিললো অরূপ ডাক্তারের চেম্বারের। ঢুকলাম। ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে তিনটে। রিসেপশনিস্ট মেয়েটির হাত নাড়া দেখে বুঝলাম বসতে হবে। বসলাম। দোতলা বাড়ি, নীচে চেম্বার। বেশ টু পাইস কামানোর চিহ্ন চারদিকে। দেয়ালে যামিনী রায়, চেম্বারে কুশন দেয়া সোফা। বসে আছি, রিসেপশনিস্ট মেয়েটি কার সাথে ফোনে কথা বলেই যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে। প্রায় ঘন্টা খানেক পর থাকতে না পেরে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম "আচ্ছা ডাক্তারবাবু কি আসছেন ?" ঠান্ডা গলায় উত্তর এলো "উনি এখন ব্যস্ত আছেন, ঠিক আসবেন"। ঘন্টা দেড়েক পর অরূপ ডাক্তার নামলেন সিঁড়ি বেয়ে। অমায়িক ভদ্রলোক। গলায় স্টেথো। বিগলিত গলায় বললেন "হেঁ হেঁ আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো"। "না না ও কোনো ব্যাপার না" বলতে বলতে ঢুকলাম ওনার চেম্বারে। ট্যাবলেট, ওষুধ পত্র টেবিলে ছড়ানো, দেখে মনে হল আমাদের কোম্পানির ওষুধ সব। পেপার ওয়েটের নীচ থেকে কাগজ তুলে গুছিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলেন ধনপতজীর কথা। অবিনাশ বাবু কেমন আছেন জিজ্ঞেস করাতে বললাম "আপনার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করতে বলেছেন"। একটা শীতল দৃষ্টিতে ঠোঁটের ফাঁকে চিলতে হাসি ঝুলিয়ে বললেন "সবই ওপরওয়ালার আশীর্বাদ, আমরা তো নিমিত্ত মাত্র"। নতুন ওষুধ পত্র বুঝিয়ে দিয়ে পেমেন্ট নিয়ে বেরোতে যাবো হঠাৎই অরূপ ডাক্তার একটা শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন "সন্ধের আগে ফিরছেন তো ?"। অবাক হয়ে বললাম "ঠিক বুঝলাম না আজ অনেকেই জিজ্ঞেস করেছেন কিন্তু আপনি ও হঠাৎ ? মানে ..." অরূপ ডাক্তার হিমশীতল শূন্য দৃষ্টিতে বললেন "শহুরে মানুষ, অভ্যেস নেই, দিনকাল ভালো না, সন্ধের পর কত কি হতে পারে তাই সাবধান করে দিলাম"।

ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে দেখি সন্ধে প্রায় নামতে চললো। অল্প অল্প ঠান্ডা ও লাগছে। হাঁটা লাগালাম জোরে। মনে হচ্ছে ঠিকই যাচ্ছি। এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে জঙ্গল, পানা পুকুর পেরিয়ে দেখি পৌঁছেছি এক তিন রাস্তার মোড়ে। মনে হল এদিক দিয়ে তো আসিনি। সর্বনাশ, রাস্তা হারিয়েছি নির্ঘাৎ। স্টেশন কোন দিকে বুঝতেও পারছিনা। অন্ধকার রাস্তা, আলো নেই, পকেটে এতগুলো টাকা। কেন সবাই জিজ্ঞেস করছিলো সন্ধের আগে ফিরছি কিনা? অজানা এক আতঙ্ক যেন ঘিরে ধরতে আরম্ভ করলো। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘাম দিতে লাগলো। হঠাৎ মনে হলো একটু দূরে রাস্তার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। পরনে গেঞ্জি আর নীল লুঙ্গি। এই ঠান্ডায় গেঞ্জি? চাষী টাষি হবে নিশ্চয়ই। মুখে গামছা ঢাকা। চেঁচিয়ে বললাম "ও দাদা, স্টেশন কোন দিকে বলতে পারেন?" কোনো উত্তর না দিয়ে হাত নেড়ে ডেকে চলতে শুরু করে দিলো। নিশ্চয়ই স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। পিছু নিলাম। কিন্তু লোকটা কে? গামছা দিয়ে ঢাকার জন্য মুখ দেখতে পাচ্ছি না। হাঁটার স্পীড বাড়ালে সেও তাড়াতাড়ি হাঁটে। অন্ধকারে বেশ কয়েক রাস্তার বাঁক পেড়িয়ে মনে হল কাঁচা রাস্তায় এলাম। লোকটা এগিয়ে চলেছে। শর্টকাট হবে হয়তো। কাঁচা রাস্তাটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে গেছে। এগিয়ে দেখি এ কি? এ তো রেল লাইন!! কিন্তু লোকটা কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না তো? থমকে এদিক ওদিক তাকিয়ে এগোতে যাবো হঠাৎ মাটিতে কিছু একটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলাম। তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে ভয় আর আতঙ্কে হাত পা ঠান্ডা হয়ে শিড়দাঁড়া দিয়ে চোরা স্রোত নামতে লাগলো। রেল লাইনের ধারে পড়ে আছে ডেডবডি। গলাকাটা। পরনে সেই সাদা গেঞ্জি নীল লুঙ্গি। কাটা গলার কাছে চাপ চাপ কালো রক্ত জমাট বেঁধে আছে। ভয়ে আতঙ্কে আমার চারপাশটা কেমন অন্ধকার হয়ে যেতে লাগলো, শরীর অবশ হয়ে আসছিলো, মাথা ঘুরতে লাগলো। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরতে বুঝলাম কাঠের চেয়ারে শুয়ে আছি। ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞেস করলাম "আমি কোথায়?"। মনে হলো দু চার জন হুমড়ি খেয়ে আমাকে দেখছে। তার মধ্যে একজন চশমা ও কালো কোট পরা। বললেন "আপনি ওয়েটিং রুমে, এখন ঠিক আছেন? লাইনের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন তো, ভাগ্যিস আমাদের লেভেল ক্রসিংয়ের গ্যাং-ম্যান দেখতে পায়, নইলে তো ..."। আমতা আমতা করে বললাম "ও ওখানে ডেডবডি পড়ে আছে, সাদা গেঞ্জি নীল লুঙ্গি"। অন্য লোক দুজন একে অন্যের মুখ চাওয়া চায়ি করলো। বললো "কানা ক্ষ্যাপা ... আবার ফিরে এইচে"। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম "কানা ক্ষ্যাপা?"। লোকটা বললো "মজুর খাটতো গো, গত বর্ষায় জ্বর হলো আর অরূপ ডাক্তারের

ওষুধ খেয়ে বেচারা পাগল হয়ে গেসলো"। পাশের লোকটা বললো "ছ'মাস আগে রেললাইনে গলা দেয়, সুইসাইড"। স্টেশন মাস্টার চশমাটা ঠিক করে বিড়বিড়িয়ে "সব জালি ওষুধ" বলে জলের গ্লাসটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন "ডাউন হাওড়া লোকাল আর দশ মিনিটের মধ্যে ঢুকবে"।

পরের দিনই রেজিগনেশন লেটার গনপতের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আসি। পরের মাসে চাকরি পেয়ে দিল্লি চলে যাই। বেশ কিছুদিন পর ছোটমামার থেকে জানতে পারি অপলা ফার্মার অফিসে আর ছাপড়ার ফ্যাক্টরিতে পুলিশের রেড হয়েছে। গনপতজী পলাতক। অবিনাশ বাবু জেলে। শুধু অরূপ ডাক্তারের কি হলো শেষে আর জানতে পারিনি।

মনোলগ

স্নিগ্ধা সেন

বন্দী হয়ে আছি একটা গণ্ডী'র মধ্যে। চারপাশ ঘিরে ভয় আর অবিশ্বাস। হেরে যাবার, হারিয়ে যাবার। একেবারে পরাজিত পরযুদস্ত আমি। কার কাছে ? জানি বয়েস হয়েছে, শরীরের অবধারিত ক্ষয়, মনোবল হারিয়ে ফেলা এ সব স্বাভাবিক। দেহেমনে একটা হতাশার ভার। তবে কি জানেন, ভাঙ্গাচোরা হয়ে থাকতে ভাল লাগে কি ? তাই প্রাণান্তকর একটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি গন্ডী'টা পার হয়ে বাইরে আসবার।

সেই যে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত ছিলেন, আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে কত কী খোয়াব দেখতেন আমি যেন তেমনি একটা ঘোরে থাকতে চাইছি। একটা যাদু বাকশো জোগাড় করে নিয়েছি। বিচিত্র তার ভাণ্ডার। চাবি কাঠি আমার মনের মধ্যে রাখা। এত দিনের জীবনে যা চেয়েছি, যা জেনেছি, গল্প হয়ে যা জমে রয়েছে আমার স্বপ্নে, আমার কল্পনায়, কুড়িয়ে নেওয়া অনেক তথ্য – ঐতিহাসিক, প্রাগৈতিহাসিক, প্রত্নতাত্বিক, ভূতাত্বিক, হাজার রকম, কিছু পূর্ণ কিছু অসম্পূর্ণ মিলে মিশে একাকার হয়ে সেই বাকশোতে ঠাসা রয়েছে। রহস্যময়, আপাতঅর্থহীন সেই সঞ্চয়।

বাকশোর ডালা'টা আস্তে আস্তে খুলেছি। একটা মস্তবড় আয়না আমার সামনে। তাতে ছায়া পড়েছে ছোটো একটি মেয়ের। ও তো আমি। প্রথম দিন স্কুলে গিয়েছি। অবাক হয়ে দেখছি নিজেকে – ক্লাসঘরের জানালায়। পেছনে অনেক মুখ, ওই মেয়েরই মত কৌতুহলী, একটু বা ভীতু – নতুন পরিবেশ যে !

জানালার কাঁচ একটা অস্বচ্ছ আয়না হয়ে গিয়েছে। আয়নার এ পিঠ যেমন রোদ ঝকমকে, ও পিঠে পারার আস্তর, আঁচড় পড়েছে, খুবলে ক্ষতচিহ্নের মত কুশ্রী দাগ এখানে সেখানে। এ দিকের মেয়েটির মত আর একজন দাঁড়িয়ে আছে আয়নার ও পিঠে। রোগা ক্ষয়া তার চেহারা। ওর ধারণা আয়নার যে কোন দিকে দাঁড়ালেই সবাইকে খুশি আর সুন্দর দেখাবে।

এই মেয়েটির কথা আমি এখন ভেবে নিলাম। ওর অস্তিত্ব আমার জীবনে ছিল না। ও যেন আয়নার উলটো দিকের মত আমার উলটো দিক। এই যে আমি ঘাগরা স্কার্ট পরে মাথায় ফুলের ব্যান্ড লাগিয়ে মায়ের হাত ধরে চলেছি, – আজ স্কুলে কনসার্ট আছে, আমি পারফর্ম করব। ওপাশের মেয়েটির গায়ে একটা ঢলঢলে জামা। ওর মা যে বাড়িতে বাসন মাজে তারা তাদের বাতিল করা ক'টা জামা দিয়েছে, মাপসই কিনা দেখার দরকার মনে করে নি কেউ। ও চলেছে নাচতে নাচতে। খুব ফুর্তি ওর, পাড়াতে বাঁদর নাচ হচ্ছে। নিজে নাই বা নাচল, বাঁদর নাচলে হাত তালি দেবে, বাঁদর সেলাম করবে, কম মজা ? বাঁদরওয়ালা ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে ওকে বলবে, "মুন্নিকে সাথ তু ভি খা লে দো চার বাদাম"। বাঁদর দাঁত খিঁচোবে, হয়তো বন্ধুত্ব করতে চেয়ে, কে জানে !

আবার এলাম আয়নার এদিকে মানে আমার সাজানো গুছোনো জীবনে। আমি বড়ো হচ্ছি। আমি নাকি খুব ট্যালেন্টেড, কত কিছু শিখছি। আলমারিতে প্রাইজ সাজানো, আবৃত্তি, নাচ, অভিনয় সবেতেই পাওয়া। লেখাপড়াও চলছে আমার বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য প্রমাণ করে।

অন্য মেয়েটিও স্কুলে যেতে শুরু করেছে। পাড়াতেই স্কুল। যে দিদিমণি পড়ান, তিনি আধা মেমসাহেব। তাঁর পড়ানো ও বুঝতেই পারে না। জিজ্ঞেস করতে ভয় পায়। ও বোঝে না দেখে দিদিমণি নাক কুঁচকে বলেন ডিসগাস্টিং। কথাটার মানে ও জানে না। তবে নোংরা একটা বেড়াল পায়ের কাছে ঘুর ঘুর করলে ঠিক ওমনি ভাবেই ও বলে ডিসগাস্টিং। ছোট ভাইটা খিলখিল করে হাসে।

আয়নার এ পাশে সানাই বাজছে। ভেবেছিলাম নাচ নিয়ে জীবন কাটাবো, দেশে বিদেশে ঘুরবো দল নিয়ে, হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনায়াসে একটি ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে গিয়েছি, ইংরেজী সাহিত্যে। কিন্তু অধ্যাপনা বা গবেষণা আমার লক্ষ্য নয়। ইতোমধ্যে বাবা মা ব্যস্ত সুপাত্রের সন্ধানে। মিলেও গেল। বিদেশবাসী পাত্র আমার বায়ো ডেটা দেখে চমৎকৃত হয়ে রাজি হয়ে গেছেন। নাচ ব্যাপারটা একটা বাড়তি কোয়ালিফিকেশন মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীটা জ্বলজ্বলে তকমার মত গায়ে সেঁটে আমি আমার স্বামীর সমাজে অধিষ্ঠিত হলাম।

ও পারের মেয়েটি ? সে ও কি ঘরণী হয়ে গিয়েছে এত দিনে ? কে বিয়ে দেবে ওর ? মা তো প্যানডেমিকের সময় মারা গিয়েছে। ভাইটা পালিয়ে গিয়েছে কোন এক জাহাজীর সঙ্গে। একবার খবর এসেছিল চাকরী পেয়েছে, জাহাজে জাহাজেই ঘুরবে। বাড়ি কি দিদি কারোর সম্বন্ধেই কোন টান অনুভব করে না। মেয়েটি যে স্কুলে পড়তো সেখান থেকে ক্লাস এইটের একটা পাস সার্টিফিকেট নিয়েছে বড়দিকে বলে। মা যে সব বাড়িতে কাজ করত তাদের একজনের দয়াতে জুনিয়র নার্সিং এর প্রাইভেট কোর্স করছে এখন। যিনি দয়া করে খরচটা দিচ্ছেন তাঁর সঙ্গে সর্ত যে চাকরী করে টাকা শোধ করে দেবে। চাকরী সে পাবে সেই দয়াবতী মহিলার ভাইয়ের নার্সিং হোমে। সেখানে ওর পাওনা বেতন কেটে ধারের টাকা ফেরত নেওয়া হবে।

নিতান্ত সাধারণ মেয়েটি এতদিনে বুঝেছে জীবনসংগ্রাম কাকে বলে। তাই সে জানে এখানে থেমে থাকলে চলবে না। আরো কিছু পড়াশুনো, আরো কোয়ালিফিকেশন দরকার। দরকার একটা ভাল কাজের, সসম্মানে বাঁচবার জন্য।

আয়নার এ দিকের খবর ? বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন ? কি ছিমছাম সাজানো। হ্যাঁ, ভারি শখ করে কেনা হয়েছিল, যত্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছিলাম আমি। যেটা করি সেটা অন্যদের চাইতে ভাল করতে পারি সব সময়েই। সংসার ও করব ট্রফি পাওয়ার মত, এমনই সবাই ভেবেছিলেন। বিদেশবাস মানে একটা আড়ম্বর আর বৈভবের জীবন। সেখানে কিসের অভাব ?

কিন্তু প্রতিবেশী বন্ধুরা এ কি বলছেন ? ওই বাড়িতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তো চলে গিয়েছেন অনেকদিন। স্বামী স্ত্রী আলাদা থাকেন। ছেলেমেয়ে নেই। এমন ভাবেন নি, না ? কেন, ভালই তো আছি। অনেক বিবাহ বিচ্ছিন্না স্বাবলম্বী মহিলা যেমন থাকেন।

অন্য মেয়েটিও নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে এতদিনে। বেশ কিছু পরীক্ষা দিয়ে নিয়ম মাফিক রাস্তায় হয়ে গিয়েছে একজন সিনিয়র নার্স, একটি সুপরিচিত নার্সিং হোমে।

আয়নার দিকে আর দেখছি না। আমরা দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি। ভেবে নিন একটা নতুন গল্পের শুরু হল বা একটা নতুন মোড় নিলপুরনো গল্পটাই। সাহিত্যের ছাত্রী আমি, পড়া কবিতার টুকরো মনে ভেসে ওঠে। সেই যে বিদেশী কবি কল্পনা করেছিলেন উনি আর মৃত্যু চলেছেন এক গাড়িতে; ছোট গাড়িতে শুধু ওঁদের দুজনের মতই জায়গা। না না কোন নেগেটিভ কথা বলব না। এ রকম মনে হল কারণ ঘটনাচক্রে আমরা দুজন আছি এই ভাবেই, কাছাকাছি। অসুস্থ হয়ে ফিরে এসেছি দেশে। ট্রিটমেন্ট চলছে আর আমার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছে সেই মেয়েটিই। আমি ডিমেনশিয়া রোগে আক্রান্ত। আমার পার্শ্বচরী ইতোমধ্যে এই রোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভরসাযোগ্য কেয়ারগিভার হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে।

আমি যেখানে চাকরী করতাম তাঁরা আমার পদের গুরুত্বের কারণে আমার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছেন। আমি বাড়িতেই থাকব, আমাকে স্পেশাল সিকলিভ স্যাংশন করা হয়েছে। রোগের নিরাময় প্রতিশ্রুত নয় কিন্তু তার অগ্রগতিকে রোধ করা যাবে কিছু সময়ের জন্য। আমি চলেছি ভুলে যাবার রাস্তায়, ধীরে, ফেরা নেই।

আমার সবসময়ের সঙ্গী স্বাভাবিক বুদ্ধি খাটিয়ে আমার নড়বড়ে স্মৃতিকে খাড়া রাখবার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করেছে। যেমন আমি খেলাম কিনা মনে রাখতে পারি না বলে নানা রঙের প্লেট আমদানী করা হয়েছে। নীল প্লেটে আমার সকালের খাবার আসে। সেটি না ধোওয়া অবস্থায় টেবিলের উপর পড়ে থাকে যতক্ষণ আমার দুপুরের খাবার না আসে। আমি তো ভাবতে পারব না সকালের খাবার খাই নি। বিভিন্ন সময়ে খাবার পাত্র বিভিন্ন রঙের হলে আমার অভিযোগ করার সুযোগ থাকবে না।

জামা, ছেড়ে রাখা আর নতুন যেটি পরবার তফাৎ করবার জন্য স্নানঘরের সামনে দুটি দু'রকম গামলা রাখা আছে। প্রতিদিন দেখা হচ্ছে অথচ পরিচয় গোলমাল করে ফেলছি বলে সবাই কে বলে রাখা হয়েছে নিজের নাম এবং সম্পর্ক পরোক্ষে জানিয়ে দিতে। তবু এমন হচ্ছে যে পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস মালহোত্রাকে খেদিয়ে দিচ্ছি সেলসগার্ল এসে উত্যক্ত করছে ভেবে বা ক্যুরিয়ার সার্ভিস এর স্মার্ট ছেলেটিকে বলছি অফিসের কলকাতা ব্রাঞ্চে কবে বদলি হয়ে এলেন ?

একটা খাতা আছে আমার। তাতে হোমটাস্ক করার মত রোজ লিখতে হয় সেদিন কি খেয়েছি, কার সঙ্গে দেখা হয়েছে ইত্যাদি। মনে না পড়লে ধরিয়ে দেওয়া হয়।

একদিন আমি বললাম, "এই হলুদ প্লেট কে রেখেছে এখানে ? আমি তো ব্রেকফাস্টই করিনি এখনও।"

"এখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। আপনি চা বিস্কুট খেয়েছেন একটু আগে। নীল প্লেটে কাল সকালে আবার খাবেন।"

"সন্ধে হয়ে গেল ? কি আশ্চর্য ! আমি স্নান করি নি তো আজ।"

"করেছেন – অই দেখুন আপনার ছাড়া কাপড় রয়েছে ওধারে গামলাতে।"

"ভুলে গিয়েছি একেবারে। কে যেন এসেছিল না ? যেতে দেরী করছিল, আমি ভাবছিলাম কখন স্নান করব। কে এসেছিল বলুন তো ?"

"আজ তো কেউ আসে নি।"

"ও। কাল এসেছিল। আমার যেন মনে হচ্ছিল . . . ."

"কালও কেউ আসে নি। আজ সকালে ফোন এসেছিল যে আপনার বন্ধু সামনের শনিবার দেখা করতে আসবেন।"

"তাই ? তবে স্নান করলাম না কেন ?"

"করেছেন। জামা পাল্টিয়েছেন। দেখুন, আজকে পরবার জামা যেটাতে থাকে সেই গামলা খালি।"

"ঠিক ঠিক। কে যেন আসবে বললেন। কবে আসবে ?"

"পরশু মানে শনিবার।"

"পরশু শনিবার ? না না আজতো সবে বুধবার।"

"ক্যালেন্ডার দেখুন। বুধবারের তারিখ আপনি নিজে কেটেছেন আজ সকালে।"

"এ রকম ভুল বাড়তে লাগল আমার। নার্স মেয়েটিকে একদিন বললাম আমার টাকাপয়সা ফুরিয়ে যাচ্ছে। আপনার পেমেন্ট করব কি করে ?"

"আমাকে তো আপনার অফিস স্যালারি দেয়। আপনি চিন্তা করবেন না।"

"আমার অফিস ? কেন ? আমার ইনসিওরেন্স করা ছিল না ?"

"অফিসই ইনসিওরেন্স এর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রেখেছে। আপনি আমাকে বলেছিলেন আমি যখন প্রথম আসি।"

"কি জানি, সব এত গোলমাল হয়ে যায়।"

এর পর আমি নিজের ঘরই চিনতে পারলাম না। রাগারাগি করতে লাগলাম আমাকে বাড়ি ছাড়া করা হয়েছে বলে। সঙ্গের মেয়েটিকে বললাম পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব। আমাকে কিডন্যাপ করে আনা হয়েছে। একটা অচেনা ঘরে . . . .।

আচ্ছা, এই কি হবে আমার গল্পের পরিণতি ? যাদুবাকশো কি এর জন্যে খুলেছিলাম ? ঘুরে এলাম সেই হতাশার অন্ধকার গর্তে। – আমার সামনে যে রাস্তা সে আমাকে কোথাও পৌঁছিয়ে দিল না। এক চক্রপথে ঘুরেই চলেছি, ঘুরছি তো ঘুরছিই ।

তিমি মাহাত্ম্য

সহেলি বন্দ্যোপাধ্যায়

হঠাৎ করে খুব ভোর বেলায় চট জলদি ঘুমটা ভেঙে গেল দীপালির ওরফে দীপুর। ক্যালিফর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকো'র একটি সুসজ্জিত হোটেলের বন্ধ ঘর থেকেই শোনা যাচ্ছে সমুদ্র গর্জন, কাল অনেক রাতে হোটেলে এসে পৌঁছালেও ভোর না হতে হতেই ক্লান্তি উধাও। দীপু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কলেজে পিএইচডি করতে এসেছে, বিশাল কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়া তার একমাত্র নেশা। বেড়াতে যাওয়া, দেশ দেখা একটা ভীষণ ভালোবাসার জায়গা দীপালির কাছে। এবারে যাওয়ার প্ল্যান ছিল Highway এক ধরে Drive করে যাবার। গন্তব্যস্থল মন্টেরা বে। পথটার দুপাশে নাকি অপরূপ মনোরম দৃশ্য, একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে সমুদ্র, কলেজে অনেকেই বলাবলি করেছিল। কাল তাই দুপুরের দিকে বেরিয়ে পড়েছিল সান ফ্রান্সিসকো হোটেল থেকে লাঞ্চ খাবার পরই। রুট এক ধরে ড্রাইভ করে আসছিল ... প্রায় ১৫০ মাইল রাস্তা ... যেখানে ডান হাতের প্রশান্ত মহাসাগরের নয়নাভিরাম নীলাভ ঢেউ আছড়ে গর্জে উঠছিল সিয়েরা নেভাদা পাহাড়ের পাদদেশে, কখনো কখনো অসম্ভব সাহসিকতায় তার বক্ষদেশ স্পর্শ করে যেন আরো কাছে সরে আসতে চাইছিল। আর বাম দিকে শুধুই নিকষ কালো রুক্ষ সিয়েদা নেভাদা পর্বতমালা। সিয়েরা নেভাদার বক্ষ চিরে আধুনিক প্রযুক্তিতে মানুষ বানিয়েছে রাস্তা, সেই রাস্তা বরাবর চলতে চলতে মনে হচ্ছিলো এ পথ যেন কখনো শেষ না হয়ে চলতেই থাকে দূরে, দূরে ... আরো দূরে ... সুদূরে যেখানে সাগর গিয়ে মিশতে পারে আকাশের গহন গহীনে ... যেখানে নীলিমায় নীল যেন প্রতিবিম্ব খুঁজে পায় তার একান্ত নিখিলের।

মন্টেরা বে হোটেলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় রাত ১০ টা হয়ে গেল। যদিও তিন / চার ঘন্টারই পথ, তবু সারা পথ থেমে থেমে আসতে আসতে অনেকক্ষণ লেগে গেলো। বাতাসে একটা হালকা ধরণের ঠান্ডা সময়টা জুন মাস হলেও। বিছানায় যেতে না যেতেই ঘুমে কখন তলিয়ে গেছিলো দীপু জানে না, ভোর বেলার দিকে ঘুম সেই ভেঙেই গেল। যে কারণে মন্টেরা বে তে আসা, সমুদ্র ঘিরে তৈরি হয়েছে জীবন্ত একুইরিয়াম, না কোনো কৃত্রিম ভাবে বানানো নয়, তবে আজ দীপু জীবন সার্থক করতে এসেছে মহাসাগরের মাঝে তিমি মাছ দেখবে বলে।

কোনো রকমে একটু ব্রেকফাস্ট শেষ করে বেরিয়ে পড়ল দীপু। হোটেল থেকেই বার বার বলে দিয়েছিল কম খাওয়া দাওয়া করে বেরোতে। পথটা ক্রমশ ঢালু হতে হতে Bay-র দিকে চলেছে। পথের পাশে পাশে নানা রকমের খাবার দোকান। বেশির ভাগই সব সমুদ্রের মাছের নানা রকমের লোভনীয় আইটেম। এতো সুগন্ধ বেরিয়েছে যে দীপু মাছ খায় না তারও খেতে ইচ্ছে করে গেলো। অগত্যা একটা সালমন মাছের বার্গার কিনে একটা বোট এ চড়ে পড়ল সে। আহা কি সুন্দর, চারিদিকে শুধু নীলচে কালো জল আর জল, বিশাল মহাসাগরের ব্যাপ্ততা অনুভব করতে করতে চলল সে। সাগর যতই গভীর হতে থাকলো জল নীলচে থেকে ক্রমশ ঘন কালো হয়ে উঠতে থাকলো। বোটটা যে খুব ছোট তা নয় বলা যেতে পারে মাঝারি গোছের, এক সাথে ৫০/৬০ লোক ধরে। হাতে ধরা খাবারের প্যাকেটটা থেকে ফাটাফাটি গন্ধ আসছে, লোভ সামলানো প্রায় দায়, বোট এবার ছেড়ে দেবে, ঘোষণা হচ্ছে "Don't eat any food now…" ধুর বাবা, কে এত শোনে, তাড়াতাড়ি সালমন স্যান্ডউইচ শেষ করে ফেললো দীপু। বোটের চালক অনেক উপদেশ বাণী দিয়ে বোট স্টার্ট করে দিয়েছে এবার। ও বাবা, এ কি দুলুনি, মনে হচ্ছে এ সিট থেকে পড়ে গিয়ে উল্টোদিকের সিট এ পড়ে যাবে। বিশাল মহাসাগরের মাঝে যে মোচার খোলার মতো আর বুঝতে অসুবিধে নেই। যারা বাইরের ডেকে দাঁড়িয়েছিল সবাইকে দেখলাম বকেঝকে বোট-এর ভিতর পাঠিয়ে দেওয়া হল। না আর ভালো লাগছে না, দীপুর বমির ধাত নেই, কিন্তু মনে হচ্ছে অন্নপ্রাশনের ভাত টুকু পর্যন্ত উঠে আসছে। বোটের লোকজনদের দেখি গা সওয়া ব্যাপার, নিশ্চিন্ত মনে

এদিক ওদিক পায়চারি করছে আর বলছে ... "Please let us know if you need a packet to vomit." কয়েকজন এর মধ্যে বমি করেও ফেললো। ব্যস, দীপুরও প্রচণ্ড গা গুলচ্ছে আর দেখবি তো দেখ দীপুও সমস্ত সালমন স্যান্ডউইচটা বমি করে ফেলেছে। এবার বোঝা গেল এরা কেন এত খেতে না করছিল। প্রায় ১ ঘন্টা জলের দোলায় কুস্তি করতে করতে মাঝ সমুদ্রে এসে বোট থামিয়ে দিল। এ কি হল বোট হঠাৎ থেমে গেল কেন?

বলতে বলতেই হঠাৎ করে ফোয়ারা ... বিশাল কালো এক জীবন্ত দানব জল থেকে উঠে ডিগবাজি দিয়ে আবার জলেই প্রবেশ করলেন ... তার তিন কোণা লেজটা শুধু খানিকক্ষণ অবধি জলের ওপর শোভা বর্ধিত করে আবার জলেই লুকিয়ে পড়লো। উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন বোটের সবাই, ডেকে লোকের ভিড় জমে উঠেছে আবার। বোট চালক মাইকে বলে যাচ্ছে গড়গড় করে, বোধহয় description দিচ্ছে, তবে মনে হল সে দিকে কারোরই মন নেই, সবাই মহাসাগরের গর্ভে এই অতি মহাজীবটির খেলা দেখতেই ব্যস্ত। বলতে বলতেই আরো একটা, দুটো, ও বাবা সারে সারে। দীপু হাঁ করে দেখছে। ওরে বাবা রে, ৩ টা একসাথে সাগরের বুকে ডিগবাজি খেলো। মনে হলো অভিবাদন জানালো দীপু কে। শোনা গেল, এগুলি নাকি হাম্পব্যাক whale, লম্বায় প্রায় ৫০-৫২ ফুট আর প্রায় ৬০০০০ - ৬৫০০০ পাউন্ড ওজনে। এতো বড় প্রাণী নাকি শুধু মাছ ছাড়া কিছুই খায় না, দাঁতও নেই সেই ভাবে, চোখের দৃষ্টিও কম, কিন্তু এতো বড় হাঁ, সব কপাৎ করে গিলে নেয়। দীপুর তো রোগা পাকাটির মত চেহারা, মা ছেলেবেলায় বলত, ওরে চিবিয়ে খা, না হলে গায়ে গত্তি লাগে না। কিন্তু, এ কি রকম ভগবানের বিচার, শুধু মাছ গিলে গিলে খেয়ে এতো বড় শরীর! একসাথে জড়ো হয়ে ঘুরছে sea gull-এর দল। Whale জলের ওপরে উঠলেই তার চর্বির চামড়ার ওপর থেকে blubber খেয়ে নিয়ে চলছে তাদেরও ভোজন পর্ব। হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল দীপু মহাসাগরের মাঝে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে নিজেদের খুশি মতো গড়ে উঠেছে সংসার ... বিশাল কান্ড কারখানা চলছে অথচ তার কতটুকুর হিসেব বা খোঁজ কেউ জানতে পারে?

Whale দেখতে গিয়ে দীপু চোখের সানগ্লাসটা জলে ফেলেছে, পাশে এক আমেরিকান বয়স্ক লোক ছিলেন, বোধহয় দীপুর দাদুর বয়সেরই হবে, বললেন, "চিন্তা করো না মা Mr. Whale তোমার জন্য নিয়ে গিয়ে শো কেস-এ রেখে দেবে।" ফিরতে হবে আবার সেই অসম্ভব সেই ঢেউয়ের দোলায় ... হঠাৎ করে দীপুর মনটা ভীষণ ভালো লাগছে ... যাকে বলে ফুরফুরে হয়ে গেছে ... ঢেউয়ের দোলা তেমন আর কিছু লাগলো না, বেশ সাহসী হয়ে উঠেছে মনে হয় ... পাড়ে পৌঁছেতেই খিদেটা আবার অনুভব হল দীপুর, তবে এবারে আর সালমন মাছের বার্গার নয়, অন্য অনেক দারুণ দারুণ আইটেম আছে, অর্ডার দিতে হবে। পিছনে তাকিয়ে সেই জলের দাপুটে মহারাজকে প্রণাম করে মনে মনে বলল Mr. Whale, আমার sunglasses-টা তোমার বউকেই আপাততঃ পরতে দিও। এ জন্মের মতো ধার দিলাম। যা খেল দেখলাম তা আমার সঞ্চয় হয়ে রইলো চির জীবনের মতো।"

মনের কোণায় ছোট্ট সকাল

ঊর্মি চক্রবর্তী

ছুটির দিন হলে কি হবে, যথারীতি ভোর ৫টায় ঘুম ভেঙে গেল। যদিও ভাবলাম যে এত তাড়াতাড়ি উঠবো কেন? বরং ঘণ্টা-খানেক পরে উঠি, এখনো বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিন্তু বিছানায় শুয়ে আর চোখের দুই পাতা এক করতে পারলাম না, আর উঠে পড়লাম। আমার সব চেয়ে প্রিয় ছোট্ট মিষ্টি Brownie দেখি খুব আদর করে করুন স্বরে "ম্যাও ম্যাও" করে ডাকাডাকি করছে। যেহেতু Brownieর প্রতিদিনের অভ্যেস ভোর পাঁচটায় উঠে ব্রেকফাস্ট খাওয়া, তাই বাগানের বিছানা থেকে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে এক দৌড়ে এসে সে আমার পায়ে মাথা দিয়ে ঘষাঘষি করতে লাগলো আর আমি ওকে বাটিতে seafood cocktail দিলাম খেতে। হাত মুখ ধুয়ে গরম গরম টোয়াইনিংসের আর্ল-গ্রে চা নিয়ে বাগানে বসবো বসবো বলে ভাবছিলাম, দেখি পুরো কুয়াশায় ঢেকে গেছে আমাদের বাগান, আর কোন কিচ্ছু দেখা যাচ্ছেনা। Brownie পেটভরে খেয়ে আবার "মিয়াও" বলে বাগানের দিকে মনের আনন্দে লেজের ডগা নাড়াতে নাড়াতে গেল চলে। শেষমেষ আমিও বাগানের দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে চা শেষ করে ঠিক করলাম একটু হেঁটে আসি। ঠান্ডাটা অন্য দিনের তুলনায় ছিল কম। তাই একটা পুরো হাতার সাদা টপ সাথে বাদামী রঙের হাত কাটা জ্যাকেট, গলায় মাফলার আর নীল টাইট প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়লাম মর্নিংওয়াকে।

উফফফ ... কি অসাধারণ একটা মায়াবী পরিবেশ – চারিদিক পুরো নিস্তব্ধ। কুয়াশায় চারদিক ভরা আর পাখিদের হালকা আওয়াজ ভেসে আসছে কানে। হাঁটা শুরু করতেই একটা আলাদা অনুভূতি হতে লাগলো আর ওই মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য মনে হল যেন আমি দক্ষিণ ভারতের কোডাইকানালে আছি যেখানে কুয়াশায় হারিয়ে গিয়েছিলাম ১০ বছর আগে। স্মৃতি যেন আবার চোখের সামনে জলছবির মতন ভেসে উঠলো। দুটো দুরকমের দেশ, অথচ কত সাদৃশ্য সেটা কল্পনাও করা যায়না। অস্ট্রেলিয়াতে থেকেও সেদিনের মর্নিংওয়াকে যেন সেই হারিয়ে যাওয়া পুরনো দিনগুলোকে খুঁজে পেলাম।

ভোরবেলায় হাঁটার একটা আলাদা আনন্দ পাওয়া যায়, আর সেটা যদি ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকা চারিদিক হয়। ৫০ মিটার দূরত্বে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই অনুভূতিকে বর্ণনা করা অসম্ভব। দিনের শুরুটা যদি কুয়াশার মধ্যে দিয়ে নিজেকে হারিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার চেয়ে বড় পাওনা হয়তো আর কিছু হয়না। ছোট ছোট জিনিসে আমি খুব আনন্দ পাই আর যেহেতু বেড়াতে খুব ভালবাসি তাই আজকের দিনটা আমার কাছে একটা বিশেষ দিন বলে মনে হল। শীতকালের প্রত্যেকটা দিন যেন অন্য রূপে ধরা দেয় আর মনের দুঃখ কষ্টকে ক্ষণিকের জন্য হলেও ভুলিয়ে দেয়।

বেশ কয়েক মাইল একা একা মর্নিংওয়াক করতে করতে দু চারজন মানুষজন চোখে পড়লো। দেখি নানান ডাকে পাখিরা এক গাছ থেকে আরেক গাছে উড়ে যাচ্ছে, আবার এক দল পাখি উড়ে যাচ্ছে আকাশে। তার সাথে kookaburra পাখি ডেকে যাচ্ছে আর হাল্কা করে ট্রেনের শব্দ কানে ভেসে আসছিল দূর থেকে। সূর্য উঠতে তখন খানিক দেরি আর এক টানা হাঁটার পর ভাবলাম একটু কোথাও বসে এই পরিবেশকে উপভোগ করা যাক। কুয়াশা একটু কম হওয়াতে চোখে পড়লো যে দূরে ক্যাফেটেরিয়া সবে খুলছে। সেনোরিটা ক্যাফেটেরিয়া, এলাকার সব থেকে ভালো কফি পাওয়া যায়। হাঁটতে হাঁটতে ভাবলাম যে এক কাপ কফি হলে মন্দ হয়না। যদিও চা খেয়ে বেরিয়েছি কিন্তু এক কাপ কফি এই ঠান্ডায় শরীরটাকে একটু গরম রাখবে আর ভোরের এই মনোরম দৃশ্যকে অনুভব করা যাবে।

মনের আনন্দে আস্তে আস্তে ক্যাফেটেরিয়ার দিকে এগোলাম আর সেখানে পৌঁছে দেখি একজন ৭০ বছর বয়সী ইটালিয়ান মহিলা কফি বানাচ্ছে ও তার সাথে তিন রকমের মাফিন সাজানো আছে – ব্লুবেরি, অরেঞ্জ পপি ও ট্রিপল

চকলেট। ভীষণ মিষ্টি ব্যবহার ওই ক্যাফেটারিয়ার মহিলার। আমাকে বললেন "গুড মর্নিং মাই love. My name is Fiona. How are you? What would you like to have today?" দু তিনজন আগেই উপস্থিত ছিল ওই ক্যাফে তে আর সবাই গুড মর্নিং উইশ করলো কফি খেতে খেতে। আমি একটা লার্জ ক্যাপাচিনো ও আমার প্রিয় ব্লুবেরি মাফিন অর্ডার করলাম। যে মহিলা কফি বানাচ্ছিলেন – ওনার গালভরা হাসি মুখ, মিষ্টি ব্যবহার আর আন্তরিকতা অতুলনীয়। মনে হল যে কারোর যদি দুঃখ ক্লান্তি থাকে তাহলে সেনোরিটা ক্যাফেটেরিয়াতে এলে নিমেষে সেই দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে।

কফি ও মাফিন খেতে খেতে ডেভিড, ব্রেন্ডন, মার্সেলা ও লিলিয়ানার সাথে পরিচয় হল। একে অপরের কথা জিজ্ঞেস করাতে বেশ মজার ঘটনা জানলাম কেননা বিভিন্ন দেশ – ইটালি, লন্ডন, গ্রীস, জাপান ইত্যাদি থেকে আসা সবাই অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা। শুধুমাত্র ব্রেন্ডন ইন্ডিয়াতে গেছেন ওনার কর্মসূত্রে মাস খানেকের জন্য তাই তার অনুভব বললেন – তাজমহল ও রাজস্থানের সৌন্দর্যে তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নানান রাজ্য, নানান খাবার ও সংস্কৃতি দেখে একেবারে বিস্মিত হয়ে গেছিলেন। ওনার গল্প শুনে বাকিরা ইন্ডিয়া যাওয়ার খুব উৎসাহ দেখালো। ব্রেন্ডন সাথে সাথে উল্লেখ করলেন যে উনি আবার যাবেন ইন্ডিয়াতে আর তখন দক্ষিণ ভারতের কেরালা'তে যাবেন। কেননা সবাই বলেছে যে ওখানে এত সবুজ আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে গেলে মন ভরে যাবে। আমিও বিভিন্ন দেশের কথা বেশ মনযোগ দিয়ে শুনছিলাম। প্রায় ঘন্টা খানেক আড্ডা দেয়ার পর সবাই যে যার বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

শীতকাল, তাই বেশ দেরি করে সূর্য ওঠে। আকাশ জুড়ে লাল রঙের ছটার অপূর্ব দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। কুয়াশা আস্তে আস্তে কাটছে আর আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বাড়িতে পৌঁছলাম হেঁটে। ততক্ষণে ঝলমলে রোদ উঠে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে একটু ফ্রেশ হয়ে মেথির পরোটা, মটর মাসরুম আর সুজির হালুয়া বানালাম। নিজের হাতের বানানো খাবার খেয়ে টিভিতে একটু খবর শুনে আবার নিত্যদিনের কাজে লেগে পড়লাম। আজকের ভোরবেলাটা বেশ আনন্দে কাটলো আর একটা স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। জীবনের এই ছোট্ট ছোট্ট পাওয়াগুলোই তো সঞ্চয় করে রাখা ... তাই না?

প্রকৃতি আমার শিক্ষাগুরু

দেবীকা ব্যানার্জ্জী

প্রকৃতির কোলেই জন্ম আমার। প্রকৃতির কাছেই আঁকা শেখা। জন্ম হয়েছিল বোকারোতে। আড়াই বছর বয়সে চলে এলাম দুর্গাপুরে। তখন গাছপালা আর জঙ্গল কেটে, ধানক্ষেত বুজিয়ে নতুন শহর তৈরী হচ্ছে। বাবা বোকারো থেকে বদলি হয়ে এলেন দুর্গাপুরে। তখন সামান্য কিছু সংখ্যক বাড়ি ছিল সেখানে। আমাদের থাকার বাংলোগুলো তখন নতুন তৈরী হয়েছে। প্রতিটি বাংলোর চারিদিকে তার কাঁটা দিয়ে ঘেরা অনেক জমি ছিল। বাংলোর উঠানে ছিল লেবু গাছ, কলা গাছ, আম ও পেয়ারার গাছ। উঠানের বাইরেও ঘেরা জায়গায় ছিল ডুমুর, পেয়ারা, বেল, আম, জাম প্রভৃতি গাছ। বাংলোর মেন গেটের বাইরেও প্রতিটি বাংলোর সামনেই ঘেরা জায়গায় ছিল কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, ইউক্যালিপটাস আর বেগুনী রঙের থোকা থোকা ফুলের গাছ। মেন রাস্তার দুধারেও ছিল বড় বড় গাছ। একদিকের মেনরাস্তার ধারে ছিল রেললাইন। সেখানে গাছের ফাঁক দিয়ে রেলগাড়িকে কু ঝিক ঝিক শব্দ করে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যেতে দেখা যেত। অন্য দিকের মেন রাস্তার ধারে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যেত সবুজ ধানের ক্ষেত। ক্ষেতের পাশেই ছিল লাল সুড়কির রাস্তা। মাথার উপরে নীল আকাশে সাদা মেঘের ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যেত বালিহাঁস ও নানা পাখির দল। ওরা যেত দামোদর নদীর চড়ে। সূর্যাস্তের সময় নানা রঙের মেঘের ওপরে দিয়ে ফিরে যেত তারা আপন কুলায়। বৃষ্টির পড়েই দেখা যেত রামধনুর সাতরঙা আলো। সূর্য ওঠার রাঙা বেলা আর সূর্যাস্তের সময় সূর্য ডোবার মিষ্টি লাল সূর্য ঘিরে দেখা যেত রাঙা মেঘের খেলা। পুকুর ধারে দেখা যেত মাছ ধরার জন্য হাঁসেদের আনাগোনা, আরও কত প্রাকৃতিক দৃশ্য। প্রকৃতির এই বিশাল জীবন্ত ছবির মাঝেই ঘুরে বেরিয়েছি ছোটবেলায়।

এছাড়াও বাড়ির ঘেরা জায়গাতে ছিলে প্রচুর ফুল, ফল ও সবজির বাগান। বাবার গাছ লাগানোর বড় শখ ছিল। বড় গেট দিয়ে বাড়ির চত্বরে প্রবেশ করলেই সিমেন্টের রাস্তার দুধারে ফুলের গাছে ভরা ছিল। গেটের দুপাশে একদিকে ছিল লাল জবার গাছ অন্যদিকে ছিল স্থলপদ্মের গাছ। প্রতিটি ঋতুর সময় সেই ঋতুর ফুলে ভরা থাকতো বাগান। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াতো নানা রঙের প্রজাপতি, মৌমাছি, ভ্রমর ও নানান মধুপায়ী প্রাণীরা। ঘুরে বেড়াতো নানান পাখি ও ছোট ছোট জীবজন্তু।

মেনরাস্তা পেরিয়ে একটু ছুটে গেলেই একদিকে ছিল লাল মাটির রাস্তা আর গ্রাম। অন্য দিকে ছিল বিশাল বিশাল মাঠ। কাজেই ছোটবেলায় প্রকৃতির স্পর্শেই মানুষ হয়েছি। মন ছুঁয়ে যেত প্রকৃতির নানান দৃশ্য। এই প্রকৃতির টানেই প্রকৃতির বিশাল ছবিকে টুকরো টুকরো করে খাতার পাতায় সাজাতে শুরু করি চার, পাঁচ বছর বয়স থেকেই। প্রথম প্রথম ছবি এঁকেছি রঙবেরঙের ফুল, পাতা তুলে খাতার পাতায় ঘসে ঘসে। মাটি দিয়ে গড়তে শুরু করি বাসন কোসন, পুতুল ও নানা দেব দেবীর মূর্তি। বড় হতে হতে হাতে আসে আঁকার খাতা, প্যাস্টেল কালার, জল রঙ ও তুলি। শুরু হয় আল্পনা দেওয়া, মাটির পাত্রও নানারকম, পাত্রে আঁকা, স্কুলের হলে ও পরে কলেজের হলে সরস্বতী পুজোয় আল্পনা দেওয়া। মহান লোকেদের ছবি আঁকা, পুরানো গ্রামাফোন রেকর্ডের ওপর আঁকা। কলেজ পাস করতে করতে উনিশ কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গেল। এসে পড়লাম কোলকাতায়। আঁকা চলতে লাগল। সংসারে দায়িত্ব বাড়তে লাগল। দুই সন্তানের মা হয়ে গেলাম। সময়ের অভাবে আঁকা বন্ধ হয়ে গেল। ওরা একটু বড় হতেই সাতাশ আঠাশ বছর বয়স থেকে আবার আঁকার জগতে ফিরে এলাম। কিন্তু এর মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে অনেক পাহাড় আর বেশ কয়েকটি সমুদ্রের ধারে বেড়ানো হয়ে গেল। পাহাড় নদীর অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্যগুলি গাঁথা হয়ে গিয়েছিল আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে। যা প্রকাশ পেল আমার তেল রঙে আঁকা ক্যানভাসের ওপর। বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী করে আর প্রচুর অর্ডারের কাজ করতে করতে দশ বছর পেরিয়ে গেল। সাংসারিক কারণে ছবির জগৎ থেকে বিদায় নিতে হলো। সাংসারিক দায়িত্ব শেষ করে পঁচিশ বছর

পরে আবার ফিরে এলাম ছবির জগতে। ছবি আঁকা কারো কাছেই শিখিনি। প্রকৃতিই আমার শিক্ষাগুরু। প্রকৃতির নানা রূপই প্রকাশ পেয়েছে আমার ছবিতে। আজও পাহাড়, পর্বত, নদী সমুদ্রের ওপর সূর্য, চন্দ্রের উদয়, অস্তের খেলা, গাছ আর জঙ্গলের কোলে সূর্য ডোবার রাঙা আলো আর গ্রামের ছবি আঁকতেই ভালবাসি। প্রকৃতিই হাতছানি দেয় আমাকে তার রূপের ছটায় হারিয়ে যেতে। সৃষ্টি হয় ছবি।

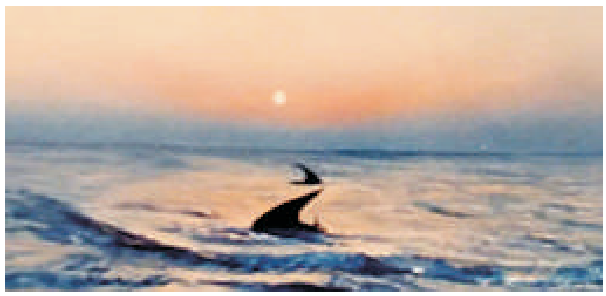

পাঠক প্রতিক্রিয়া

সুবীর রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

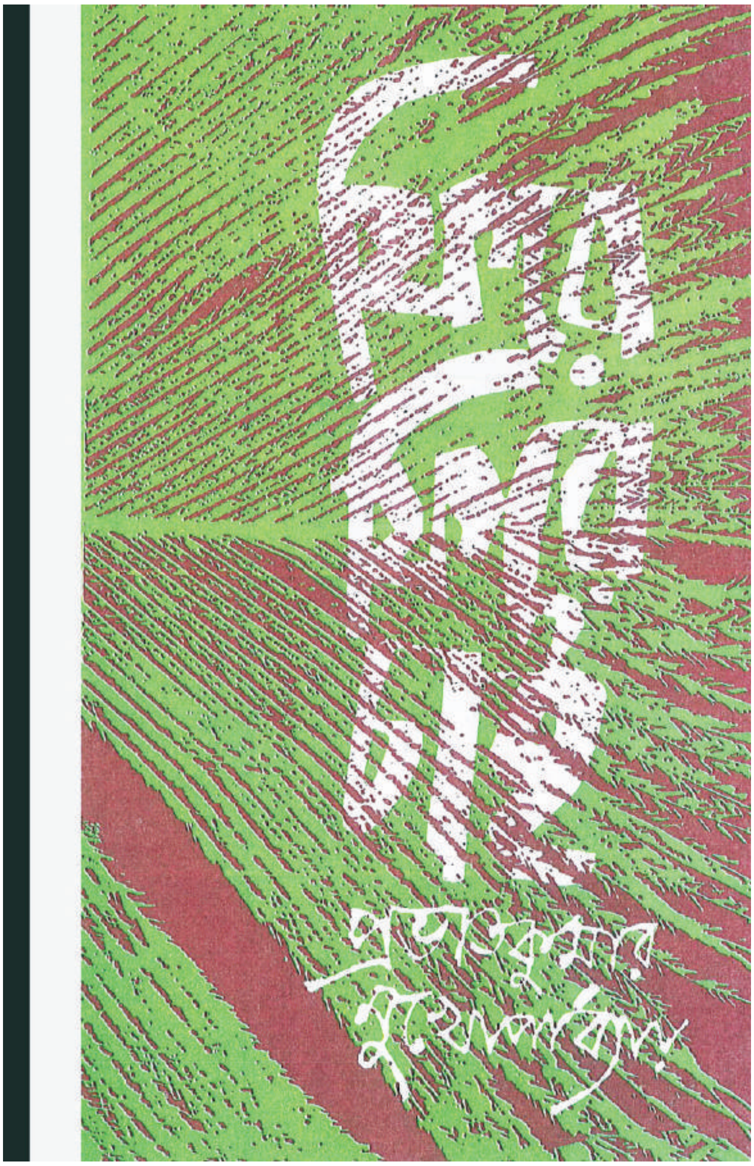

“ফিরে ফিরে চাই”

অখণ্ড সংস্করণ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লি ।

কয়েকবছর আগে কলকাতার বইমেলায় গিয়েছিলাম। সেবার আমার এক বিশেষ বন্ধু এই বইটি আমাকে উপহার দেয়। নানান কারণে এই বইটা আমার আর পড়ে হওয়া ওঠেনি। সম্প্রতি এই বইটি হাতে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম।

এই বইটি লেখকের জীবন কথা। ১৩৮৪ সালে এই বইটি প্রকাশিত হয়। যদিও এই বইটি প্রভাত কুমারের আত্মজীবনী; কিন্তু আমি ওনার লেখনীর মাধ্যমে তৎকালীন দেশ ও সমাজের এক চিত্র দেখেছি এবং সমৃদ্ধ হয়েছি। এই বই-এ শুধু বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা এবং তার থেকে বিশ্বভারতীর সূচনার বর্ণনা নয়, প্রভাত কুমারের ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত উনি চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে – এ বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন ।

আমি নিশ্চিত আমার মতো যে কোনো সাধারণ পাঠক এই বইটি হাতে নিলে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ হবেন যে, নিজেরই অজ্ঞাতে শেষ পাতায় পৌঁছে যাবেন খুব তাড়াতাড়ি। এই আত্মজীবনীর দুটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে উনি ওনার দেশের বাড়ি, শান্তিনিকেতন, দার্জিলিং, আবার পূর্ববঙ্গে, উত্তর ভারতে এবং দু'বছর কলকাতার জীবন বিবৃত করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে উনি সংসারের কথা, নানা কাজ নানা বিদ্যা, কবির মস্কো ভ্রমণ, শিলং পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া, গ্রামে যাওয়া, তালতোড় ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন এবং ফয়া ফুঙ্গি'র দেশের কথা ঝরঝরে ভাষায় বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রথম খণ্ডে সেই সময়কার বাংলার বিভিন্ন উৎসবের চিত্র – ওনার বর্ণনা যেন ছবি হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যেমন গোয়ালাদের গোষ্ঠবিহার উৎসবের কথা। এই উৎসবে সন্ধ্যার মুখে মিছিল বের হত। গরুর গাড়ির ওপর ময়ূর আঁকা সাজসজ্জা করা হত। তরজার দল গান গাইতো। এরকম অনেক না জানা উৎসবের কথা ওনার লেখনীর মাধ্যমে জেনে রোমাঞ্চিত হয়েছি।

উনি ওনার বাবার ওকালতি জীবন বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে তখনকার সময় আইনচর্চা যারা করতেন তাদের জীবনের এক ছবি পাওয়া যায়। উনি সেকালের জমিদারদের নিয়ে বিভিন্ন ঘটনার বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছেন যা মনমুগ্ধকর।

উনি লিখেছেন "১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর (১৩১২ আশ্বিন ৩০) বঙ্গচ্ছেদ সরকারীভাবে ঘোষিত হলো । সেদিন আমরা উপবাস করলাম, রাখি পরালাম সকলের হাতে – বললাম "ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই, ভেদ নাই। কিন্তু কে জানত অদৃষ্টে বিধাতাপুরুষ হাসছেন 'ভেদ নাই' শুনে।"

পার্টিশন এবং তারপরের রাজনৈতিক টানা-পোড়েনকে উনি তুলে ধরেছেন প্রাঞ্জল ভাষায়।

লেখক তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তাদের গিরিডির জীবনের কথা শুনিয়েছেন । বিশেষত গিরিডির বারগণ্ডা অঞ্চলে তখন ব্রাহ্ম সংখ্যাধিক্যর প্রতি ওনার অনুসন্ধিতার সূচনার কথা আমরা জানতে পারি ।

প্রভাত কুমারের শান্তিনিকেতনে আসা প্রসঙ্গে উনি কবি রবীন্দ্রনাথের অনুমতির কথা লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে কবি বলেন –

"চলে আসুক ছেলেটি" তিনি লেখেন নববর্ষের দিন (১৯০৯, এপ্রিল ১৫) বোলপুর পৌঁছালেন দুপুরের গাড়িতে। এরপর উনি বিস্তারিত ভাবে বোলপুরের সাথে ওনার পরিচিত হবার বর্ণনা দিয়েছেন। ওনার লেখায় তখনকার আশ্রমের এক ছবি পাওয়া যায়।

উনি লিখছেন –

"রবীন্দ্রনাথ ধ্যানস্থ। আমরা স্থির হয়ে বসে। অনেকক্ষণ কবি কথা বললেন। শব্দগুলো মনের কোন গহন থেকে উৎসারিত হয়ে আসছে। ভাষা শেষ হতেই আমরা নীরবে মন্দির ত্যাগ করে চলে এলাম। তখন সকাল হয়ে গেছে – ছেলেরা কলরব করছে।" আশ্রম জীবনের গল্প তরতরিয়ে এগিয়ে চলে। আমরা ফিরে চলে যাই সেই সময়ে। আচ্ছন্ন হই।

ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক নিয়ে উনি লিখছেন –

"রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে পড়ে শোনান 'ব্যাঙ্গ কৌতুক' থেকে 'বিনি পয়সার ভোজ' ও 'নতুন অবতার'।" "বিনি পয়সার ভোজ" এ মালি যখন কড়া তামাক সেজে এনে দিল – দু'টান দিয়ে সে কি কাশি। রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করে দেখালেন।

শান্তিনিকেতনে সে সময়ে বিভিন্ন নাটকের মহড়া ও অভিনয়ের বিস্তারিত বর্ণনা আছে এই বইটিতে। বিশেষত "মালিনী" মঞ্চস্থয়ন আমাকে সেই সময়েতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

কবির সাথে প্রভাত কুমারের কিছু কিছু অমূল্য মুহূর্তের বর্ণনা আমার হৃদয়ে মণিকোঠায় স্থান পেয়েছে। বিশেষত যখন তিনি বলছেন –

"কবির ৫০ তম জন্মোৎসবে কবির কাছ থেকে 'জীবনস্মৃতি'র খসড়া শোনা, সঙ্গে সঙ্গে চলতো সাহিত্য আলোচনা।" কবি তাদেরকে মাঝে মাঝেই নতুন বই ও তাঁর প্রিয় বই পড়ে শোনাতেন।

অসংখ্য মানুষের কথা বিবৃত করেছেন লেখক তাঁর এই বইতে। তিনি মনে করেছেন যে সম্ভবত কবির জন্মোৎসবের পরের দিন সুকুমার রায় তাঁর "অদ্ভুত রামায়ণ " দলবল নিয়ে গান করে শোনান। লেখকের এই বর্ণনা পড়তে পড়তে আমার মতন একজন সাধারণ পাঠক সেই দৃশ্যটা মনের ছবিতে পাই এবং তা দেখতে দেখতে নিজের মধ্যে হারিয়ে যাই।

প্রভাতকুমার এই বই-এ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত কথা লিখেছেন। তিনি দার্জিলিং, আবার পূর্ববঙ্গের বাজাপ্তিগ্রাম, চাঁদপুর, সিলেট, আসাম, চেরাপুঞ্জি'র ভ্রমণ বৃত্তান্ত সুনিপুণ ভঙ্গিমায় আমাদের শুনিয়েছেন ওনার লেখনীর মাধ্যমে। এই ভ্রমণে উনি বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাদের নিয়ে অনেক রোমহর্ষক গল্প শুনিয়েছেন। উত্তর ভারতে ভ্রমণ বিশেষত দিল্লির প্রতিটি দ্রষ্টব্য স্থানের ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক বই-এর কথাও উল্লেখ করেছেন সুন্দর ভাবে যা কল্পনাতীত। আমি খুবই উপভোগ করেছি যে সমস্ত চরিত্রের উনি বর্ণনা দিয়েছেন ওনার জয়পুর ও আজমীর ভ্রমণে।

এই বই-এর এক ঘটনার কথা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারলাম না। ১৯১৬ সালের গোড়ায় জোড়াসাঁকো'র বাড়িতে 'ফাল্গুনী' ও 'বৈরাগ্য সাধন'-এর অভিনয় হবে – বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

প্রভাত কুমার অল্প বয়সে তাঁর দাড়ির প্রতি দুর্বল ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল তাঁর দাড়ি তাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। যথারীতি নিজের দাড়ির প্রতি তাঁর বড় মায়া ছিল। কিন্তু কবি বললেন "তুমি নবীন সর্দার-এর ভূমিকায় অভিনয় করছো, ওই চরিত্রে তোমাকে দাড়িতে মানাবে না, তোমাকে দাড়ি কামাতে হবে"। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভাতকুমারকে দাড়ি কামাতে হয়। দাড়ি কামাবার পর প্রভাতকুমারকে দেখে কবি সহাস্যে বলেন – "বাঃ এই তো সুন্দর মেঘমুক্ত প্রভাত" এরপর প্রভাতকুমার লিখেছেন "ভাবলাম বলি, মেঘমুক্ত রবির শোভাও তো দেখবার মতো – কিন্তু বলার সাহস হল না" এই অংশটুকু পড়তে পড়তে আমি নিজের হাসি থামাতে পারছিলাম না। প্রভাতকুমার এর রসবোধ এই বইজুড়ে। তাই পাঠক এই বই পড়ে যে খুব উপভোগ করবেন এ আমার স্থির বিশ্বাস।

এই বইটির একটি অধ্যায়ে প্রভাতকুমার তাঁর কলকাতায় ফিরে আসা এবং ওখানকার জীবন বৃত্তান্ত সুন্দর ভাবে আমাদের শুনিয়েছেন। ওনার কলকাতার সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিকের চাকরির খুঁটিনাটি ঘটনাবলির সাথে আমাদের পরিচিত করেন। এই পর্যায়ে তাঁর অপরিসীম ইতিহাসের জ্ঞানের সাথে আমাদের সম্যক পরিচিতি হয়। সেই সময়ের বড়ো বড়ো অধ্যাপকরা ওনার জ্ঞানের জন্য ওনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং ওনাকে সম্মান করতেন। Modern Review পত্রিকায় ওনার প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং তা সে সময়কার বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া জাগায়। তাঁর

স্মৃতিচারণে তাঁর কলকাতা থাকাকালীন নিয়মিত জোড়াসাঁকো যাতায়াত এবং ওখানে কাজ করার উল্লেখ আছে। এই বই-এ উনি ওনার সংসার জীবনের কথা বলেছেন। তাঁর বউদির বোন "সুধা"র সাথে প্রেম ও পরিচয়ের বর্ণনা পড়ে রোমাঞ্চিত হয়েছি।

তাঁর লেখা "প্রাচীন ইতিহাসের গল্প" বইটিতে যদুনাথ সরকার ভূমিকা লেখেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন বই লেখার কথা তাঁর এই আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

শান্তিনিকেতনে তিনি তাঁর বহু ভাষা শিক্ষার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এই বইটিতে।

তিনি তাঁর চীনা ধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে বই লেখা সম্পর্কে জানিয়েছেন। তিনি মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধধর্মে ভারতীয় সাহিত্যের প্রসার, তিব্বতের সাহিত্য, ধর্ম ইতিহাস ইংরাজীতে বই লিখেছিলেন, কিন্তু দুঃখবসত সেই পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়।

এই বইটিতে প্রভাতকুমার তাঁর গ্রামে ফেরার কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন তাঁর জমি হল ভুবনডাঙ্গা বাড়ির সীমা শূন্য প্রান্তে ডাকবাংলো জমির সীমানা বরাবর। ১৯৩০ সালে মাঠের বাড়িতে ঘর বানানো শুরু হল। সেই বাড়ি নিয়ে নানা রকম বিপত্তি, অসংখ্য ঘটনা এবং বাঁধ সংস্কারের জন্য লড়াই তাঁর নেতৃত্বর বর্ণনা মাধ্যমে প্রভাতকুমার এর চারিত্রিক বৈশিষ্ঠর আরেকটা দিক আমরা দেখতে পাই এবং মুগ্ধ হই।

তিনি তাঁর 'ইউনিয়ন বোর্ড'র আখ্যানের মাধ্যমে তাঁর সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের নিয়ে এই সংগ্রাম করেছেন। তিনি লিখেছেন সাঁওতাল, মুসলমান যাদের নির্বাচনে দাঁড় করানো হয়েছিল, তারা সবাই নির্বাচিত হয়েছিল। উনি President পদে নির্বাচিত হন। তিনি চার বছর সেই দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

প্রভাতকুমারের এই আত্মজীবনীতে ওনার ভিতরকার রসবোধ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। উনি ওনার আসে পাশের ঘটনাগুলি ও চরিত্রদের গভীর অন্তরদৃষ্টি দিয়ে হাল্কাচালে বিবৃত করেছেন। তাই এই আত্মজীবনী যে এক সময়ের শুধু একজন মানুষের জীবনের গল্প নয় – এই বই সে সময়কার মানুষের জীবনযাত্রার এক অনন্য দলিল।

এই বই শুধু সুখপাঠ্যই নয়, এই বই আমাকে এক অবর্ণনীয় ভালোলাগার আবেগে আছন্ন রেখেছিল। একজন সাধারণ পাঠক হিসাবে তাই সাহিত্যপ্রেমী সমস্ত পাঠককেই এই বই পড়তে অনুরোধ করবো।

পবিত্র সরোবর আর রাজকীয় পাহাড়ের দেশে – লাসা পর্ব (তিব্বত)

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

তুমি যাবে তাহলে ?

হ্যাঁ। সত্যি যাবে ?

এ আবার কেমনধারা প্রশ্ন ? যাব বলেই তো তৈরী আমি। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?

যাওয়ার তখনো বেশ কয়েক মাস দেরী। যদিও থাকার জায়গা, প্লেনের টিকেট বা অন্যান্য যা কিছু আগে থেকে book করতে হয় সেসব হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তারপরেও এই কথোপকথন। এ যেন রাতের প্রদীপের জন্যে দিনের বেলায় সলতে পাকানো।

দেখতে দেখতে এসে গেল সময়টা। জুলাই মাস, ২০২৪-শিকাগো শহরে সাজসাজ রব। এ মাসের ৪,৫,৬-এই তিনদিন ধরে চলবে উত্তর আমেরিকার বঙ্গ সংস্কৃত সম্মেলন। সেখানে আমারও দায়িত্ব ছিল কিছু। বাংলা সংস্কৃতির এই জমজমাট উদযাপন শেষ হওয়ার তিনদিন পরেই আমাদের যাত্রা। সম্মেলনের কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে আর সেটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই আয়োজন কিভাবে সুসম্পন্ন হয় সেই ভাবনাই মন জুড়ে ছিল। তাই বেরোনোর আগে উদ্বেগ বা আনন্দ কোনটাই সেভাবে অনুভব করতে পারি নি। তবে বুধবার, ১০ই জুলাই,২০২৪ শিকাগোর O'hare International Airport থেকে হংকং গামী বিমানে যখন চেপে বসলাম মনে প্রবল উত্তেজনা। মনে মনে একটা দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করছি তখন। একবার গিয়ে দাঁড়াতে চাই সেই প্রাচীন পর্বত আর পবিত্র জলরাশির সামনে। তিব্বত-বৌদ্ধমঠ, পাহাড় আর রহস্যে ঘেরা Tibetland ! ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি বড় দুর্গম সে জায়গা। অতীশ দীপঙ্কর দুর্মর সব গিরি লঙ্ঘন করে পৌঁছে গিয়েছিলেন সেখানে। সে কাহিনীতেও অনেক আলো আঁধারি। আপাততঃ যাত্রাসঙ্গী আমার পতিদেবতা সৌমেন। তারই প্রশ্নের উত্তরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বারবার 'হ্যাঁ যাব' বলে এসেছি এতদিন। কিন্তু ভয়ও আছে মনে। পথ যে সহজ নয় এমন একটা ছবি মনে আঁকা ছিল। আর সেজন্যেই একধরণের চাপা উদ্বেগ। তবে উদ্বেগ ছাপিয়ে ছিল উত্তেজনা – ছিল নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আগ্রহ।

Cathay Pacific এর বিমান যখন যখন Hongkong International Airport এর মাটি ছুঁলো স্থানীয় সময় তখন বুধবার, ১০ই জুলাই, রাত্রি সাড়ে নয়টা। Western Hongkong এর Chek Lap Kok দ্বীপে অবস্থিত এই বিমানবন্দর। তাই বিমানবন্দরের অন্য একটি নাম হল Chek Lap Cok International Airport. ইমিগ্রেশন সেরে লাগেজ নিয়ে বেরোনোর সময় লাল আলোয় লেখা City 26 minutes. বুঝলাম শহর বিমানবন্দর থেকে কিছুটা দূরে। উবারের জানালার কাচে রাখি ঘুমচোখ। বাইরে ফিকে নীল আকাশ। তার গায়ে অনুচ্চ পাহাড়ের সারি। আর পাহাড়ের কোলে আলো ঝলমলে দিগন্তরেখা। উবার ছুটে চলেছে ব্রিজ এর ওপর দিয়ে। নিচে জলরাশি। দিনের আলো নিঃশ্বেষে মুছে যাওয়ার আয়োজন চলেছে তখন। জল, পাহাড়, আর পাহাড়ের গায়ে আলোর বিন্দু – কেমন এক মায়াময় জায়গা। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম Hotel এ।

পরদিন প্রথম গন্তব্য Victoria harbor. দিনের আলোয় আগের রাতের মায়াময় ভাব কেটে গিয়ে চারপাশ স্পষ্ট। প্রথমে গেলাম পর্যটকদের বড় আকর্ষণ – Avenue Of Stars এ। চিত্রতারকাদের নামের সারি। Bruce Lee র statue র সামনে ছবি তোলার বেজায় ভিড়। হাওয়া ভারী হয়ে আছে আদ্রতায়। পাহাড়ের মাথায় মেঘেদের নিরন্তর যাওয়া আসা। বেলা একটু বাড়তেই ঘাম ঝরতে লাগলো। ক্ষিদেও পাচ্ছিলো বেশ। Harbor এর সামনে একটা দোকানে wrap আর এক কাপ coffee খেয়ে হাঁটা লাগলাম।

Argyle Street এ পৌঁছেই দর্শনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়র মহাভোজ। স্থানীয় বাজার জমজমাট। বিরাট বিরাট জুকিনি, রসালো লিচু, নানা রঙের আর আকারের মাশরুম – পসরা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতার দল। কেনাবেচা চলছে জোরকদমে। অন্যদিকে রাস্তার দুপাশে দোকানগুলিতে চলছে noodles, pot sticker, dumpling বানানোর তৎপরতা। আমি sesame ball খাওয়ার জন্যে খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না।

Nan Liam Garden, Chi Lin Nunnery হংকং শহর থেকে খুব দূরে নয় এই nunnery. কিন্তু শহুরে কোলাহল বর্জিত জায়গা। বনসাই আর পাথরের নীরব প্রদর্শনী। মন শান্ত হয় এমন পরিবেশে। জল পড়ছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে জীবনের বহমানতা। এখানে সন্ন্যাসিনীদের পরিচালিত রেস্তোঁরায় আমরা সেদিনের মধ্যাহ্নভোজ সারলাম। ভারী সুস্বাদু খাবার। সন্ধ্যেবেলা আবার গেলাম Victoria Harbor এ। Harbor তখন আলোয় ঝলমল করছে। অজস্র মানুষের সমাগম। তবে আলোর ঝলমলানি যেন বড় বেশী। ফিরে এলাম হোটেলে ট্রেন ধরে। হোটেলের রেস্তোঁরা Ming Kitchen এ নৈশাহার করলাম সে রাতে – মাশরুম আর টোফুর একটি সুস্বাদু পদ, বেগুন আর তার ওপর পেঁয়াজ রসুন ভাজার স্তর, সাদা ভাত। শেষে কাল চা। লক্ষ্য করলাম খাবারে টোফুর ব্যবহার কম। মশলাও কম।

Ngong Ping-Po Lin Monastery, Tien Tan Buddha

পরদিন সকালে উঠে ট্রেন ধরে আমরা গেলাম Ngong Ping 360 Cable Car Ride এর প্রবেশপথ পর্যন্ত। আমাদের গন্তব্য হল Lantan Island যেখানে আছে Tian Tan বুদ্ধ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৮২ মি. উঁচুতে Mount Muk Yue পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত শাক্যমুনির ব্রোঞ্জ মূর্তিটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর এক আশ্চর্য্য নিদর্শন। এটি পৃথিবীর খোলা জায়গায় অবস্থিত বুদ্ধমূর্তিগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। হংকং এ পর্যটকদের একটি বড় আকর্ষণ। তবে গন্তব্যে পৌঁছনোর আগে যাত্রাপথ। আর সে যাত্রাপথের সৌন্দর্য্যে মন ভরে গেল। cable car এর ক্রিস্টাল কেবিন এ বসে চারপাশে সবুজ পাহাড় আর নিচে South China Sea দেখতে দেখতে আধঘন্টার কিছু বেশী সময় কেটে গেল। পৌঁছে গেলাম Ngong Ping গ্রামে। এর ভিতর দিয়েই যেতে হবে বুদ্ধমূর্তি দর্শনে। কিন্তু চলতে গিয়েই আটকে গেলাম। পথের পাশে চা এর দোকান। চীনদেশে এসে চা নেব না এমন তো হতে পারে না। চা এর নেশায় ঢুকে পড়লাম দোকানটিতে। উপরি পাওনা হল সেখানে। সুবেশী মহিলা চা পরিবেশন করলেন প্রথাগত পদ্ধতিতে। সেটা একটা অভিজ্ঞতা। চা খেয়ে আবার পায়ে পায়ে এগোতে থাকলাম। শান্ত পরিবেশ। চারদিকে পদ্ম আর শালুকের জলাশয়। বাতাসে ধূপের গন্ধ। ২৬৮টি সিঁড়ি ভেঙেগে বুদ্ধমূর্তির একেবারে পদতলে পৌঁছন যায়। আমরা সে সুযোগ পাই নি। মেরামতির জন্যে উপরের চত্বরটি দড়ি দিয়ে ঘেরা ছিল। Po Lin Monastery সংলগ্ন রেস্তোঁরাটি দুপুরের আহার সারবার জন্যে আদর্শ। নিরামিষ খাবার। মুশকিল হল এখানে credit card নেওয়া হয় না। তবে আমরা বেড়াতে এসেছি আর আমাদের কাছে হংকং ডলার নেই জেনে ব্যবস্থা একটা করলেন এক কর্মচারী। এখানেই প্রথম আমি bean curd খেলাম। দেখতে দইয়ের মতো হলেও স্বাদের মিল নেই। সয়াবিন থেকে তৈরী হয় এটি। সামান্য উষ্ণ। খাওয়া সেরে চারপাশটা একটু ঘুরে বেড়িয়ে দেখলাম। সেখান থেকে সোজা গেলাম শহরে Nikon এর শোরুমে। একটি নতুন ক্যামেরা কেনা হল। না, নিছক হংকং থেকে কেনার জন্যে নয়। আগের দিন হাত থেকে পড়ে সৌমেনের ক্যামেরার লেন্সটি গেছে বরবাদ হয়ে। সেখান থেকে আবার গেলাম Victoria Harbor – গোধূলির আলোয় দিগন্তরেখা ক্যামেরাবন্দী করার আশায়। রাতের বেলা নৈশাহার সারা হবে Vegan Elements বলে এক জায়গায় – এমনটা স্থির হল। গুগল এ নিরামিষ খাওয়ার জায়গা অনুসন্ধান করে এই নামটি পাওয়া গেছে। সেখানে পৌঁছে জানা গেল তাদের একমাত্র option হল cash and carry, এবারে আর কোনমতেই অন্যথা করা গেল না। অগত্যা উল্টোদিকের Thai রেস্তোঁরাতে নুডলস আর সিদ্ধ সবজি অর্ডার দেওয়া হল ভয়ে ভয়ে। ভয় কেন ? নিরামিষ আহার আলাদাভাবে না বলা থাকে হংকংয়ের অনেক রেস্তোঁরাতেই নিরামিষ পদগুলিতেও সামুদ্রিক কোন প্রাণী বা চিংড়িমাছ থাকা বিচিত্র নয়। আমার আবার চিংড়িমাছে দারুণ এলার্জি। বছর দেড়েক আগে প্যারিসের চীনা রেস্তোঁরায় বেগুনের একটি পদ খেয়ে যা হয়েছিল সে স্মৃতি এখনো মলিন হয় নি।

Cheng Du

তারপর বেড়ালটা খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পার।" কিন্তু আমি বললাম, "বলা ভারি সহজ, কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না ?"

বেড়াল বলল, "কেন সে আর মুশকিল কি ?"

আমি বললাম, "কি করে যেতে হয় তুমি জানো ?"

বেড়াল একগাল হেসে বলল, "তা আর জানিনে ? কলকেতা, রানাঘাট, তিব্বত – ব্যাস ! সিধে রাস্তা, সওয়া ঘন্টার পথ, গেলেই হল।"

আমি বললাম, "তাহলে রাস্তাটা আমায় বাতলে দিতে পার ?"

সুকুমার রায়ের হ য ব র ল। আর পাঠকমাত্রই জানেন সওয়া ঘন্টায় তিব্বত যাওয়ার পথ বেড়াল বাতলে দিতে পারে নি মোটেই। আর গেছোদাদা , যিনি কিনা এ পথের সুলুকসন্ধান জানেন তাঁর দেখা আর কে কবে পেয়েছে ?

অগত্যা ঘুরপথেই চলেছি। পরদিন ছিল শনিবার। জুলাই ১৩,২০২৪। হংকং থেকে আড়াই ঘন্টার উড়ান। নামলাম Tianfu International Airport এ। সেখান থেকে ক্যাব ধরে হোটেলে আসতে প্রায় একঘন্টার ওপর সময় লেগে গেল। বুঝলাম এই বিমানবন্দরটি শহর থেকে বেশ অনেকটা দূরে। গাড়ীতে যেতে যেতে চেংদু যেটুকু দেখলাম তা ভারী ভাল লাগলো। ছিমছাম জায়গা। চারদিকে সবুজ পাহাড়। অল্প বৃষ্টি হচ্ছে। অনেকটা ভারতের শৈলনিবাসের মতো পরিবেশ। চেংদুর হলিডে ইন এ যখন চেক ইন করলাম তখন প্রায় বিকেল পৌনে তিনটে। বলা যেতে পারে Cheng Du থেকেই শুরু হয়ে গেল আমাদের এই সফরের মূল গন্তব্যের প্রস্তুতি। হোটেলের রিসেপশন এ জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের নামে কোন খাম এসেছে কিনা। আমাদের tour company, Tibet Vista, জানিয়েছিল যে এই হোটেলেই আমাদের তিব্বতের খামবন্দী ভিসা (যেটি ছাড়া তিব্বতে ঢোকা এবং ঘুরে দেখা অসম্ভব) অপেক্ষা করবে। কিন্তু হোটেলের সামনের ডেস্কে যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা এমন কোন খাম দেখেছেন বলে মনেই করতে পারলেন না। বেড়ে বিপদ হল ! আমরা দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। রিসেপশন এ যাঁরা আছেন তাঁরা ডাকবাক্স খালি করার দায়িত্বে থাকা ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বিগত এক সপ্তাহে কি কি খাম এসেছে সেসবও দেখতে চাইলেন। কিন্তু কোন লাভ হল না। আমাদের নাম লেখা খাম পাওয়া গেল না। আমাদের মনে উদ্বেগ জমতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে হোটেলের আরও দু'একজন কর্মী এসে জানতে চাইছেন ব্যাপারটা কি। এঁদেরই একজন একটা ফ্রন্ট ডেস্কের নিচে একটা ড্রয়ার টানতেই বেরিয়ে পড়ল কাঙ্ক্ষিত সেই খাম। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমাদের। কারণ এটি খুঁজে না পেলে আমাদের পুরো সফরটিই বাতিল করতে হত। সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা আর কোথাও বেরোলাম না। হোটেলের রেস্টুরেন্টে রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরেরদিন দুপুরবেলা চেং দু থেকে লাসার flight – তিব্বত যাওয়ার উত্তেজনা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হচ্ছে মনে। পরদিন সকাল থেকে অঝোরধারায় বৃষ্টি। হঠাৎই আমরা ঠিক করলাম এতদূর যখন এসেই পড়েছি তখন এখানে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding টা ঘুরেই এয়ারপোর্ট যাব। সকাল সাতটায় হোটেল থেকে চেক আউট করলাম। ইংরাজী বলতে পারেন এমন মানুষের সংখ্যা এখানে অল্প। তাই আমরা কি করতে চাই সেসব বোঝাতে সময় লাগছে বেশ। যাই হোক, Panda Base এ পৌঁছে দেখি লোকে লোকারণ্য। ছাতা মাথায় দলে দলে লোকজন চলেছেন। সেই ভিড়ের একটা বড় অংশ শিশু আর কিশোর। আমরা ঘন্টা খানেকের মধ্যেই তিনটে পাণ্ডার দেখা পেলাম। মনের সুখে তারা বাঁশের ডাল ভাঙছে আর চিবোচ্ছে। সে ভারী মজার ব্যাপার ! অনেকখানি জায়গা জুড়ে গবেষণা কেন্দ্র ও সংরক্ষিত বনভূমি। আমাদের প্লেন ধরার তাড়া। তাই খুব বেশী সময় সেখানে কাটান গেল না। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলাম

Tianfu Airport. আগেই বলেছি যে এবারে গন্তব্য তিব্বতের রাজধানী লাসা। China Eastern এর লাসাগামী বিমান ছাড়বে ২১১ নং গেট থেকে। গেটের কাছেই আছে লম্বা টানা সোফা অপেক্ষমান যাত্রীদের জন্যে বসা ও শরীর লম্বা করার চমৎকার ব্যবস্থা। আলাদা কোনো টিকেট কেটে লাউঞ্জে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

লাসা

কয়েক কোটি বছর আগে নাকি হিমালয় পর্বত নামে কোন পাহাড় ভূ-ভারতে ছিল না। তার জায়গায় ছিল এক অগভীর সমুদ্র। ভূ বিজ্ঞনীদের মতে প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয় পর্বত, সেখানে ছিল টেথিস সাগর। পুরাণে নাকি হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলকে বলা হয়েছে অন্তরীক্ষ। হিমালয়ের উত্তরে পামির অঞ্চলের নাম ছিল বোধহয় ইলাবৃত বর্ষ। আর এরই মাঝখানে ছিল মেরু পর্বত। মেরু পার্বতকেই স্বর্গ বলে অভিহিত করা হত। বৈবস্বত মনুর কালে বিবস্বান নাম দেবতা জাতির একজন অন্তরীক্ষের রাজা হয়েছিলেন। আর তাঁর ভাই ইন্দ্র হয়েছিলেন স্বর্গের রাজা। তবে এসব হল কাহিনী। দৈত্যকুলে বড় হচ্ছে হিরণ্যাক্ষ। মল্ল যুদ্ধ করতে বেরোল সে। তার পরাক্রমে ভীত ইন্দ্র সাহায্য নিলেন বিষ্ণুর। তাঁকে দিয়ে বধ করালেন হিরণ্যাক্ষকে। দেবতা ও দানবের বিবাদ আরম্ভ হল। পাহাড়ে উপত্যকায় শান্তি নেই। যুযুধান দুই পক্ষ। বলশালী দানবেরা দাঁড়িয়ে আছেন একদিকে। অন্যদিকে সৌম্যকান্তি দেবতারা। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে আকাশ বাতাসের শান্তি বিঘ্নিত। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ধ্বনিত হচ্ছে রণদুন্দুভি। "শুনছো, উঠে দেখো একবার নিচের দিকে তাকিয়ে।" দেবদানবের রণক্ষেত্র থেকে নেমে আসতে সময় লাগলো। একে গল্পের ঘোর, সেইসঙ্গে প্রায় চোদ্দ ঘন্টার সময়ের তফাৎ। চোখ লেগে গিয়েছিল আর কি!। সৌমেনের ধাক্কায় খুব বিরক্ত হয়ে চোখ খুললাম। বিমান তখনও মাটি ছোঁয় নি। নীচের দিকে তাকিয়ে চমকে গেলাম – মেঘ, পাহাড়, উপত্যকা আর গিরিখাতের নাটকীয় প্রবেশ ঘটেছে রঙ্গমঞ্চে। অসাধারণ দৃশ্য ! বিমানের জানালার কাচ থেকে চোখ সরাতে পারি নি। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখছি নীল, সাদা, খয়েরী আর সবুজের জমকালো এক ক্যানভাস। নির্ধারিত সময়ে বিমান পৌঁছল লাসাতে। লাসার বিমানবন্দরটি ছোট। Luggage নিয়ে বেরোতে দশ মিনিটের বেশী সময় লাগল না। তিব্বত পৌঁছলাম অবশেষে। বইতে পড়েছি যে তিব্বতের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। অনেক পর্যটক আসেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমির রুক্ষ ও পর্বতময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আমার কি প্রত্যাশা ? ভেবে দেখলাম আমার মনের জানালা খোলা রেখেই নেমেছি এ পথে। ব্যয় বা সঞ্চয়ের চিন্তা না করেই। দেখায় যাক না কি আছে সামনে।

লাগেজ নিয়ে বিমানবন্দর থেকে বেরোনোর দরজার সামনের জায়গাটিতে অপেক্ষা করছেন অনেকে। সঙ্গের ব্যাগপত্তরের চেহারা দেখে বুঝলাম এঁরাও আমাদেরই মতো পর্যটক। এক ঝলক দেখে মনে হয় যেন ইওরোপ থেকে বেড়াতে আসা মানুষেরাই সংখ্যায় বেশী। সম্প্রতি তিব্বত চীন দেশের একটি অঙ্গরাজ্য হলেও তিব্বতের নিজস্ব কিছু নিয়মকানুন আছে। চায়না ভিসা ছাড়াও লাগে আলাদা অনুমতিপত্র যেটি আমরা প্রায় না পেতে পেতেও পেয়ে গেছিলাম চেং দু র হোটেলে। তাই একজন পথপ্রদর্শক ছাড়া তিব্বতে ঘোরা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। আমাদের দেখেই এগিয়ে এলেন Tibet Vista র প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে থাকা কোম্পানীর স্থানীয় প্রতিনিধি। আমাদের দুজনের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন সাদা রঙের সিল্কের একটি ওড়না মতো। বললেন, তিব্বতী ভাষায় এটিকে "খাটা" বলে। পরে জেনেছি জাতি – ধর্ম নির্বিশেষে এভাবে যাত্রীদের স্বাগত জানানো তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের একটি প্রচলিত প্রথা। এই সাধারণ প্রথাটিই শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও মৈত্রীর দ্যোতক হয়ে উঠেছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের মতো অন্যান্যদের গলাতেও জড়িয়ে আছে সাদা রঙের সিল্ক স্কার্ফ। মুহূর্তে একরকমের আত্মীয়তা বোধ হল সব যাত্রীদের সঙ্গে। চোদ্দ দিনের তিব্বত সফরের এই সূচনা। প্রকৃত যাত্রাও যেন এই শুরু হল। এয়ারপোর্ট এ অপেক্ষা করছি অচেনা যাত্রা সঙ্গীদের জন্যে। আমরা কখনো ট্যুর গ্রুপ এর সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাই নি। তাই এ অভিজ্ঞতাও আমাদের কাছে নতুন। অপেক্ষা করতে করতেই আলাপ হল ডেনমার্ক এর Marty, রাশিয়ার অল্পবয়সী এক দম্পতি, আর আর্জেন্টিনার Edward এর

সঙ্গে। কেউ কৈলাস পরিক্রমার পরেও যাবেন আরও উত্তরে, কেউ বা চারদিন পরেই চলে যাবেন লাওস, কেউ আবার আমাদেরই মতো কৈলাস মানস দর্শন সেরে ফেরার পথ ধরবেন। যাঁদের আসার কথা তাঁরা সব এক এক করে জড়ো হলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে। তারপর আট দশজন মিলে একটি মিনিভ্যান এ চড়ে এলাম Hotel Xin Ding এ। পথের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা লাসা নদী। আকাশ আর মাটির সীমানা ঘিরে পাহাড়। এই পাহাড়ের ঘেরাটোপ সারা সময় জুড়ে থাকবে আমাদের সঙ্গে। এই সবে শুরু। তবে চারপাশের প্রকৃতিতে ঠিক মনোসংযোগ করতে পারলাম না – ভয়ানক মাথা ধরেছে। তখন জানতাম না এই মাথাধরাও সঙ্গী হবে সারা সময় ধরে। তিব্বতীয় মালভূমিকে বলা হয় "Roof Of The World"। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মালভূমিটির উচ্চতা প্রায় ৪,০০০-৫,০০০ মি. (১৩,০০০-১৫,০০০ ফুট)-সেখানে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই যে মাথা যন্ত্রণা শুরু হবে সে আর বেশীকথা কি ? উত্তরে কুনলুন পর্বতমালা, দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে হিমালয় আর কারাকোরাম পর্বতমালার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিস্তার এই মালভূমি অঞ্চলের। শুধু সীমান্ত ঘিরেই নয়, মালভূমি জুড়ে জড়ামরি করে আছে পাহাড় আর উচ্চভূমি। শিলা আছে, তাই জলও আছে। মালভূমির উত্তরভাগে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে অগুণতি নোনা জলের হ্রদ। আর দক্ষিণে, পাথরের বুক চিরে বেরিয়েছে নদী। ভারতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নদী – সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্রের উৎসও তিব্বতীয় মালভূমির দক্ষিণাঞ্চল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদীর মধ্যে আছে Yangtze নদী (Chang Jiang), Huang He (Yellow River বা পীত নদী), Mekong, Salween, আর Tarim. নদী ও পাহাড় বিছানো সুবিস্তীর্ণ এই মালভূমির ভৌগোলিক প্রকৃতি একেবারেই এ অঞ্চলের নিজস্ব।

Drepung Monastery, Sera Monastery , Guide Tenjing

পরদিন হোটেলেই প্রাতঃরাশ সারলাম। সেখানে অন্যান্য খাবারের সঙ্গে স্থানীয় তিব্বতী খাবারও ছিল মেনুতে। উষ্ণ পানীয়ের মধ্যে ছিল চা, কফি আর মাখন চা (Butter Tea) – শেষোক্ত পানীয়টি আগে কোনদিন খাই নি। ইয়াকের দুধের মাখন থেকে তৈরী হয় এই চা। সামান্য নোনতা ভাব চা এ। সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ হোটেলের লবিতে জড় হলাম আমরা কয়েকজন। আর সেখানেই দেখা হল আমাদের সফরের পথপ্রদর্শক তেনজিং এর সঙ্গে। তেনজিং স্থানীয় মানুষ। সফরের বাকী দিনগুলিতে এই তেনজিং এর কথা বারেবারেই আসবে। আলাপ হবে আরও নিবিড়ভাবে। তেনজিং এর নির্দেশে আমরা বাসে উঠে বসলাম। পরিচয় হল অন্যান্য সহযাত্রীদের সঙ্গে। আমাদের সামনে বসেছেন Carmen. France থেকে এসেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই তিব্বতে বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে তাঁর। ঘুরে দেখেছেন ছোট ছোট nunnery – ভিক্ষুনীদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন। Carmen এর পাশেই ভিয়েতনামী চি। সে আপাততঃ Houston থেকে এসেছে। আমাদের পিছনে এক হাঙ্গেরিয়ান দম্পতি – Thomas আর Elena. বাসে আরও দুজন আছেন। নাম জিজ্ঞাসা করে জানলাম Edward আর Natalie – যথাক্রমে আর্জেন্টিনা ও জার্মানি থেকে এসেছেন তাঁরা। হঠাৎ কানে এল, "আপনি জিজ্ঞাসা করুন দাদা যদি ড্রাইভার এর পাশে বসতে পারেন। ভিডিও করবেন তো !" বাংলাভাষা শুনে তাঁদের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে পারা গেল না। আলাপও হয়ে গ্যালো তখুনি। আমরা ভারতীয় শুনে বললেন, "ভারতবর্ষ থেকে আসছেন না নিশ্চয়ই। ভারতীয়দের তো ভিসা দেয় না চীন সরকার।" চারপাশে দিগন্তঘেরা পাহাড় – কোথায় শুরু কোথায় শেষ জানা নেই। ভিসা প্রসঙ্গে মানুষের তৈরী করা মানচিত্রের কথা মনে এল। বাংলাদেশী ভাইদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দুই যুবক উঠে এল বাসে। পরে জেনেছি তারা পরস্পরের বাল্যবন্ধু – স্পেনের ফ্রাঙ্ক আর রাফা। এইবারে বাস ছাড়ল। বুঝলাম আগামী দিনগুলিতে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা এই মানুষগুলোই আমাদের যাত্রাসঙ্গী। তেমনভাবে চেনাজানা হবে কি পথের সঙ্গীদের সঙ্গে ? জানি না। তবে আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

"তিব্বতে যাহা কিছু সব মঠে ও মন্দিরে। মন্দিরগুলিতে নানা দেবতার বড় বড় মূর্তি : মঠগুলি লামায় পরিপূর্ণ, কোন কোন মঠে তিন হাজার, চার হাজার, কোন মঠে সাত হাজার পর্যন্ত লামা থাকিয়া পূজা-পাঠ জপ-ধ্যানাদি অভ্যাস করিতেছেন। মঠের মধ্যস্থলে একটি চৈত্য – তাহাকে ঘিরিয়া লামাদের বাসস্থান, সাধনার আসন, দেওয়ালেরই গায়ে খোদাই -করা সিংহাসন, চেয়ারের মতো বসিবার স্থান। শীত নিবারণের জন্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে – কোথাও বা তাহার

উপর জল ফুটিতেছে; প্রয়োজনমতো কেহ তাহাতে বটিকা সাহায্যে চা প্রস্তুত করিয়া পান করিতেছেন, আবার ধ্যানে বসিতেছেন।"

(তিব্বতের পথে হিমালয়ে/ স্বামী অখণ্ডানন্দ)

আমাদের প্রথম দ্রষ্টব্য দ্রীপঙ মঠ। এককালে এই বৌদ্ধমঠ ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম বৌদ্ধমঠগুলির মধ্যে একটি। ছিল বৌদ্ধশাস্ত্র পঠনপাঠনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। "দ্রীপঙ কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল চালের স্তূপ।" পাহাড়ের ওপর অবস্থিত একগুচ্ছ সাদা বাড়ী মিলে এই মঠ যেন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম। দূর থেকে চালের স্তূপের মতোই দেখতে লাগে অনেকটা। ভিতরের অলিগলি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয় সেই মধ্যযুগেই আটকে আছে সময়। এককালে যেখানে প্রায় ৭০০০ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী থাকতেন, আজ সেখানে আছেন ৬০০ জন মতো সন্ন্যাসী। ১৯৫১ সালে, চীন যখন তিব্বতের দখল নিল তখন এই মঠ আশ্রয় ছিল প্রায় ১০,০০০ জন সন্ন্যাসীর। দ্রীপঙ, সেরা আর গানদেন – এই তিনটিই তখন ছিল গেলুগপা সম্প্রদায়ের সবথেকে বড় বৌদ্ধমঠ। আর এই তিনটির মধ্যে দ্রীপঙ হল বৃহত্তম। এই মঠের অধীনে ছিল একাধিক মহাবিদ্যালয়। সেখানে চর্চার মূল বিষয় ছিল বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র। আজ এই মঠ তার পুরনো গৌরব হারিয়েছে, কিন্তু এখনো পর্যটকদের কাছে লাসা শহরের একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য এইস্থান। মঠকে ঘিরে আছে পায়ে চলা রাস্তা। সে পথ ধরে কোরা (এটি একটি তিব্বতী শব্দ যার অর্থ প্রদক্ষিণ) করা যায়। ঘুরে ঘুরে ৩৯০০ মি. পর্যন্ত ওঠে পথ। তারপর নামা। ওঠানামার পথের পাশে ধরা আছে এক বর্ণময় অতীত। দূরে তাকালে রুক্ষ উপত্যকা আর ছোটবড় পাহাড়-তিব্বতের প্রকৃতির আত্মা। রুক্ষতার মধ্যেও যে এমন সৌন্দর্য্য থাকতে পারে তা এখানে না এলে উপলব্ধি করতে পারতাম না। থেকে থেকেই মন চলে যাচ্ছে অনেক পিছনে। শহর থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত এই বৌদ্ধমঠের চারপাশে বিরাজ করছে শান্তির ভাব।

পরের গন্তব্য সেরা মঠ। মঠটি নির্মিত হয় ১৪১৯ সালে। এককালে পাঁচটি মহাবিদ্যালয় বা college নিয়ন্ত্রণ করত সেরা। ১৯৫০-৬০ এর সাঙস্কৃতিক বিপ্লবের প্রভাব অনেকটাই এড়াতে পেরেছে এই মঠ। এইখানে একটা কথা বলে রাখি। লাসা শহরে পৌঁছে নিজেদের দিনদুয়েক সময় দেওয়া দরকার এই উচ্চতায় শরীরকে অভ্যস্ত করার জন্যে। মাথাধরা ও নিঃশ্বাসের কষ্ট অনেক সময়েই পর্যটকদের নিত্যসঙ্গী হয়। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। Advil, Vicks Vapo Rub ইত্যাদি সঙ্গে নিয়েই চলেছি। চলেছি ধীরে ধীরে – আমার স্বাভাবিক গতির থেকে বেশ আস্তে। অক্সিজেন এর অভাব টের পাচ্ছি ভালোই। সেরা মঠের প্রধান কক্ষটি মনে সমীহ জাগায় – অপূর্ব কারুকাজ। সেখানেই আছে তামার বৌদ্ধমূতি। তেনজিং জানালেন ইনি শাক্যমুনি। ঘি এর প্রদীপের গন্ধে ভিতরের বাতাস ভারী। মঠের ভিতরে উজ্বল আলো নেই কোথাও। প্রায়ান্ধকারেও স্পষ্ট বর্ণবহুলতা। আলো আঁধারির জন্যেই কি এইসবমঠের কার্যকলাপ ঘিরে রহস্যের মায়াজাল বিছানো ? কাচের আলমারিতে কাপড়ে মোড়া বাণ্ডিল থাকে থাকে রাখা আছে। তেনজিং বললেন এগুলো সব বৌদ্ধ পুঁথি। অনেক নষ্ট করা হয়েছে। তবে থেকেও গেছে বেশ কিছু। কৌতূহল হচ্ছিল খুব জানতে যে কি লেখা আছে ঐসব পুঁথিগুলিতে। তন্ত্রের গুহ্য কথা ? মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায় ? দেওয়ালে ঝোলানো প্রাচীন থাঙ্কার গায়ে হাত বোলাতে ইচ্ছে করে। এক অজানা অতীতের স্পর্শ পাওয়ার লোভে। দুই জায়গাতেই মঠের ভিতরে লামাদের কার্যকলাপ স্বামী অখণ্ডানন্দের তিব্বত ভ্রমণের সময় থেকে আলাদা কিছু নয়।

এখানে দুটি বিষয় আমার সবথেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এক হল পাথরের টালি বিছানো উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে সন্ন্যাসীদের বিতর্ক। প্রতিদিন বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা এই বিতর্কসভা বসে। সেরা জে (Sera Je) কলেজের পিছনে অন্যদের সঙ্গে আমরাও অপেক্ষা করছি। তিনটে বাজতে না বাজতেই মেরুনবস্ত্র পরিহিত সন্ন্যাসীরা নানাদিক থেকে এসে জড়ো হলেন নির্দিষ্ট জায়গায়। তারপর তাঁরা জোড়ায় জোড়ায় বাদানুবাদ শুরু করলেন। দারুণ উত্তেজনা – স্থির হয়ে বসে গম্ভীর আলাপচারিতা নয় মোটেও। বিতর্কের বিষয় কিছু বুঝতে না পারলেও সন্ন্যাসীদের নাটকীয় হাবভাবে বেশ আমোদ পেয়েছি। আর অন্যটি মঠ সংলগ্ন ছাপাখানা ও গ্রন্থাগার। কাঠের ব্লকে প্রথম ছাপা বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথিটি

এখানেই সংরক্ষিত আছে। আগেকার দিনে কাঠের ব্লক ব্যবহার করে ছাপার পদ্ধতিটি এখনো টিকে আছে এখানে। মঠে সংরক্ষিত বৌদ্ধসূত্র গুলি এই পদ্ধতিতে সারানো হয়। সেইসঙ্গে নতুন পদ্ধতিও চালু হয়েছে সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে। সারা তিব্বতে এটিই একমাত্র মন্দির ছাপাখানা যেখানে আধুনিক পন্থায় বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ক বই ছাপা হয়।

সেরা থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম স্থানীয় tea house এ। ভিতরের পরিবেশ কিছুটা কলকাতার কলেজ স্ট্রিট এর coffee house এর কথা মনে করিয়ে দেয়। সিগারেটের ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে আসে প্রায়। বেশ ভিড়। তারই মধ্যে একটা টেবিল যোগাড় করে বসলাম আমরা – আমি, সৌমেন, এডওয়ার্ড, নাটালি, এলেনা, টমাস, চি, কারমেন, নিলয় আর সালাউদ্দিন ভাই। আমাদের দেশ আলাদা, ধর্ম ভিন্ন, ভাষায় মিল নেই। কিন্তু তিব্বতের এই tea house এর টেবিলে গোল হয়ে বসে গল্প করতে করতে আর ছোট ছোট কাচের গ্লাসে তিব্বতী মহিলার পরিবেশিত ধূমায়িত চা পান করতে করতে এতবিধ ভিন্নতার কথা মনেই এল না। পথ এমনভাবেই বোধহয় যাত্রীদের মধ্যে রচনা করে বন্ধনহীন গ্রন্থি।

চা খেয়ে স্থানীয় দোকানগুলিতে একটু ঘুরেফিরে দেখা হল। দেখলাম পণ্যের মধ্যে আছে নানারকম পুঁতির মালা, ব্রেসলেট, কানের দুল ইত্যাদি। বেশীর ভাগই আসল তিব্বতী পুঁতির আদলে বানানো নকল পুঁতি। আছে জপমালা আর জপের বালা – ধূসর বর্ণের কাঠের পুঁতি দিয়ে তৈরী। রুদ্রাক্ষ বা রুদ্রাক্ষের মতো নয়। কোন কোন দোকানে পাওয়া যাচ্ছে ধাতব মূর্তি, – মঞ্জুষা, তারা, শাক্যমুনি, আরও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি। এছাড়াও পুজোর ঘন্টা, ধাতুর প্রদীপ, প্রার্থনা চক্র ইত্যাদি। লাসার বাজারে "locally made" বলে যেসব জিনিস বিক্রি হচ্ছে সেগুলি বেশীর ভাগই তৈরী হয় নেপালে নির্বাসিত তিব্বতীদের হাতে। কোথাও কোথাও থাংকা ঝোলানো আছে বিক্রির জন্যে। এগুলোর মধ্যে কোনটা আবার থাংকা studio – আঁকা হচ্ছে। থাঙ্কা আঁকার কাজটি ভক্তহৃদয়ের নিষ্ঠা নিয়ে করতে হয় বলে পড়েছি। নিবেদনের মতো। ভিতরে ঢুকে দেখার ইচ্ছে থাকলেও সময় পর্যাপ্ত সময় ছিল না সেদিন। বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে দেখতেই রাতের খাওয়ার সময় হয়ে গেল। Tour Company র পক্ষ থেকে আমাদের তিব্বতে স্বাগত জানানোর জন্যে একদফা নৈশাহারের আয়োজন হয়েছিল সেদিন Shambala Kitchen নামে একটি নেপালী রেস্তোঁরায়। ভারতীয় খাবারের সঙ্গে সে খাবারের খুব একটা পার্থক্য নেই। ডাল, ভাত, রুটি, আলু ফুলকপির তরকারি, পালক পানির – মোটামুটি এই মেনু। ইয়াকের মাংস ছিল কিনা লক্ষ্য করি নি সেদিন। রেস্তোঁরায় পৌঁছেই গোটা দুয়েক মাথা যন্ত্রণা কমানোর বড়ি খেতে হল। বুঝলাম আমার অনভ্যস্ত শরীর উচ্চতা আর বাতাসে কম পরিমাণ অক্সিজেনে কাজ চালাতে চেষ্টা করছে।

Jokhang Temple, Potala Palace, Shopping At Jokhang Square

মঙ্গলবার, জুলাই ১৬, ২০২৪। লাসাতে আমাদের দ্বিতীয় দিন আজ। আজকে প্রথম দ্রষ্টব্য জোখাং মন্দির। তিব্বতের অন্যতম প্রাচীন মন্দির এটি। মন্দির নির্মিত হয় C 639-647 এর মধ্যে, রাজা সংসেন গাম্পোর আমলে। নেপালের রাজকুমারী ভৃকুটি যখন রানী হয়ে এলেন তিব্বতে তখন সঙ্গে নিয়ে এলেন অক্ষোভ্যা বুদ্ধমূর্তি। জোখাং মন্দির নির্মিত হয় রাণীর নিয়ে আসা বুদ্ধমূর্তিটির জন্যে। এই মন্দির তিব্বতীদের কাছে আজও অতি পবিত্র তীর্থস্থান। তাই ভাল ভিড় এখানে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি তিব্বতের এইসব মঠ ও মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে বিশেষ অনুমতিপত্র আর পাসপোর্ট দেখতে হয় লাইনে দাঁড়িয়ে। তেনজিং ভাই সে কাজটি করে চলেছেন দায়িত্ব সহকারে। আর প্রবেশমূল্য তো আছেই। মন্দিরে ঢোকার আগেই চোখে পড়ল মন্দির সংলগ্ন খোলা কিন্তু ঘেরা এক চত্বরে বেশ কিছু স্থানীয় মানুষ নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চলেছেন। এইরকম বিশ্বাস যেন হারিয়ে যাওয়া মধ্যযুগকে মনে করিয়ে দেয়। মন্দিরের ভিতর হাওয়ায় ভাসছে ইয়াকের দুধের মাখনের গন্ধ। মৃদুস্বরে মন্ত্র পড়া চলেছে – ওম মণিপদ্মে হুম। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে পায়ে পায়ে চলেছি আমরাও। মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে প্রদক্ষিণ করার রীতি ডানদিক ধরে। মন্দিরের গভীরে প্রার্থনা কক্ষে আছে উল্লেখযোগ্য মূর্তিগুলি। প্রধান প্রার্থনাকক্ষে আছে ছয়টি সুবিশাল মূর্তি – বাঁ দিকে

৬মিঃ উঁচু গুরু রিনপোচের মূর্তি। তাঁর পাশে পাশে আছেন উপবিষ্ট জাম্পা বা মৈত্রেয় বুদ্ধ, মুকুট পরিহিত ভবিষ্যৎ বুদ্ধ। ঘরটির একটু পিছন দিকে এবং কেন্দ্রে আছেন সহস্র বাহু অবলোকিতেশ্বর। এই প্রার্থনাকক্ষের বাইরে মন্দিরের সারি। তাদের মধ্যে যেগুলি পবিত্রতম বলে চলে আসছে সেইসব মন্দিরের সামনে ভিড় আরও বেশী। শাক্যমুনির মন্দির এমনই একটি মন্দির। ভক্তের দল মন্দিরের প্রবেশদ্বার ও প্রবেশদ্বারে ঝোলানো পর্দা স্পর্শ করে ঢুকছেন ভিতরে। চামচে করে প্রদীপে ঘি ঢালছেন পুন্যকামীরা। সেই আলোয় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে শাক্যমুনির উজ্জ্বল ধাতব মুখ। মূর্তিগুলিতে নেপালী, মিং ও হান রাজত্বকালীন স্থাপত্যরীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। কিন্তু আমার মনে হল মূর্তিগুলি অপরূপ হয়ে উঠেছে ভক্তদের ভক্তির আলোয়। ডিজিটাল দুনিয়ার বিপরীতে এ এক সম্পূর্ণ অন্য জগৎ। এই মন্দিরকে বলে "লাসার হৃদয়" – মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে মনে হয় নামটি যথাযথ। শুধু লাসা কেন, সারা তিব্বতের ধর্মভাব, যেটুকু বহু আগ্রাসন ও হিংসার আক্রমণ পার হয়ে অক্ষত আছে আজও, তার মূলসুরটি যেন ধরা পড়ে জোখাং এর চত্বরে।

জোখাং মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম পোতালা প্রাসাদে। ধর্ম থেকে রাজনীতি। লাল সাদা জমকালো পাথুরে প্রাসাদটি লাসা শহরকে চিহ্নিত করে পর্যটকদের কাছে। চতুর্থ থেকে চতুর্দশ দলাই লামার নিবাস ছিল এই প্রাসাদ। এটি লাসার একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান। পর্যটকদের ভিড় যখন খুব বেশী থাকে তখন আগে থেকে প্রাসাদে প্রবেশের জন্যে নির্দিষ্ট সময়সীমা ঠিক করে রাখতে হয়। ট্যুর বাস থেকে নেমে হেঁটে বেশ কিছুটা ওপরে উঠতে হয় ভিতরে ঢুকতে গেলে। পাহাড়ী পথে উঠতে হাঁপ ধরে যায়। আশেপাশে মানুষজনের কথাবার্তা যা কানে আসে তার মর্মার্থ কিছুটা এইরকম, "এইটুকু উঠতেই যদি হাঁপ ধরে তাহলে কৈলাস পরিক্রমা কি করে করব ? যাক, এটা প্রাথমিক একটা পরীক্ষা আমাদের পাহাড় চড়ার ক্ষমতার।" আমিও ভিতরে ভিতরে একটু উদ্বিগ্ন যে নই তা নয়। তিব্বত সফরের শেষভাগে যাব কৈলাস কোরায় এমনটাই পরিকল্পনা। তবে এখন থাক সে কথা। প্রাসাদটি প্রথম দর্শনেই মন্ত্রমুগ্ধ। চারপাশে রুক্ষ, পাথুরে লাসা উপত্যকা। তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দুর্গের মতো আকৃতির বিশাল এক প্রাসাদ। দিনের আলোয় ঝকঝক করছে প্রাসাদের গা এর লালসাদা রঙ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৩,৭০০ মি., পরিসর ১৩০,০০০ বর্গমিটার। কিন্তু এসব পরিসংখ্যান না জানলেও পোতালা প্রাসাদ দর্শনার্থীদের মনে সম্ভ্রম জাগাতে বাধ্য। প্রাসাদের ভিতরে ঘুরে দেখলে বোঝা যায় যে এটি একসময় একাধারে অনেক ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রাসাদ একদিকে যেমন ছিল সুরক্ষা দেওয়ার দুর্গ, তেমনি তিব্বতের শাসনযন্ত্র চালানোর নীতিসিদ্ধান্তও ঠিক হত এখান থেকে। বলাই বাহুল্য প্রাসাদের ভিতরে মন্দির, বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা, উপাসনালয় এসব তো ছিলই। এক কথায় পোতালা প্রাসাদ ছিল এক স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথিবী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি নরবুলিংকার গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ নির্মাণ হওয়ার পরে পোতালার প্রাসাদটি দলাই লামাদের শীতকালীন আবাসে পর্যবসিত হয়। প্রাসাদের ভিতরে ১০০০ টিরও বেশী ঘর। বলাই বাহুল্য যে সবঘরগুলিতে ঢুকে দেখতে যতটা সময় লাগে সে সময় আমাদের বরাদ্দ ছিল না। কিন্তু যা দেখলাম তাতেই বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটতে চায় না। সফর শুরু হয় লাল প্রাসাদের একেবারে উপরতলা থেকে। তারপরে ঘোরানো পথে নিচে নামতে নামতে দেখার পালা – কারুকার্যময় বুদ্ধমূর্তি, সূক্ষ্ম নকশার মন্দালা, বিরাট বিরাট স্তূপ যার নিচে শায়িত আছে মহামানবদের মরদেহের অংশবিশেষ – তিব্বতী সংস্কৃতির একটা বড় ক্যানভাস মেলা হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে। উপরে ওঠার সময় যতটা কষ্ট হয়েছিল নিচে নামার সময় ততটা নয়। নামতে নামতে একজায়গায় দাঁড়িয়ে পড়তে হয় বেশ কিছুটা সময় – সামনে দিগন্ত বিস্তৃত লাসা উপত্যকা আর Marpo জর পাহাড়। সেদিকে তাকিয়ে মন শান্ত হয়ে আসে। পাহাড়ের স্থির, গম্ভীর সৌন্দর্য্যে মন আপনা থেকেই শ্রদ্ধায় নত হয়। প্রাসাদ ও তার আশেপাশের চত্বরটি ঘুরে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় এই প্রাসাদের প্রধান গুরুত্ব আজ ক্লাসিক তিব্বতী স্থাপত্যের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে। যেন অতীত গৌরবের স্মৃতিতে সাজান এক জাদুঘর। কার্যকলাপ কমে এসেছে। একইসঙ্গে কমে এসেছে জনজীবনে বাস্তব ভূমিকা। ১৯৫৯ সালে চীনাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের সময় প্রাসাদের গায়ে গোলাগুলি লাগে। তবে বড় ক্ষতি তেমন হয় না। পরবর্তীকালে Cultural Revolution এর সময় যখন প্রাচীন তিব্বতের অনেককিছু ধ্বংস হয়ে গেছে তখনও প্রায় অক্ষত থেকে গেছে এই প্রাসাদ। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে কি সবসময় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ করা যায় ? ভিতরের প্রাণশক্তিটি ক্রমশঃ শুকিয়ে আসছে একথা বেশ বুঝতে পারা যায়।

প্রাসাদ থেকে নেমে যখন এলাম তখন গরমে আর শ্বাসকষ্টে পর্যুদস্ত অবস্থা। নিলয় আর সালাউদ্দিনভাই রাতের আলোয় পোতালা প্রাসাদের মায়াবী রূপ দেখতে আগ্রহী। এদিকে Natalie আর Edward এর আজই শেষ দিন। মাত্র আড়াইদিনের চেনাতেই তারা কাছের লোক হয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা বাকীরা তাদের সঙ্গে শেষবারের মতো নৈশাহার করতে চাই। যাই হোক, ঠিক হল কয়েক ঘন্টা পরে আমরা Lhasa Kitchen বলে একটি রেস্তোঁরায় একত্রিত হব। এবারে আমাদের হাতে কিছুটা সময় নিজেদের মতো করে ঘোরার। কিছু স্যুভেনির সংগ্রহ করার বাসনায় ফিরে গেলাম Jokhang স্কোয়ারে। পাসপোর্ট আর permit দেখিয়ে ঢুকতে হল আবারও। কিন্তু এবারে আর মন্দিরের টিকেট কাটলাম না। জোখাং মন্দিরকে কেন্দ্রে রেখে বৃত্তাকার একটি পথ। এই পথের দুধারে সারি সারি সব দোকান। এই জায়গাটিরই নাম Barkhor Street Market. এ এক মজার জায়গা। একধারে তীর্থস্থান ও বাজার – পৃথিবীর অন্য কোথাও এমন আছে বলে জানি না। একদিকে হৈ চৈ, কেনাকেটা, দরদাম চলছে। ক্রেতা বিক্রেতার কথাবার্তায় সরগরম বাজার। আবার তারই সঙ্গে পাথরের রাস্তায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে আর জপমালা ঘোরাতে ঘোরাতে চলেছেন বিশ্বাসী ভক্তেরা। তিব্বতের পবিত্র শহর বলে পরিচিত লাসার অতীন্দ্রিয়বাদের প্রাণভোমরা এই অঞ্চলটি। সেইসঙ্গে ধাক্কাধাক্কি ও ঠেলাঠেলির বাজারী অর্থনীতির পীঠস্থানও বটে। ভোগবাদ ও ত্যাগের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের অজান্তে সামিল হয়ে যাচ্ছি একদল পায়ে চলা তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে কিছুদূর গিয়ে দেখছি যেখানে শুরু করেছিলাম চলতে, সেখানেই পৌঁছে গেছি আবার। সে এক বিচিত্র ব্যাপার। একেবারে অন্যরকম অভিজ্ঞতা। পুরোনো তিব্বতের ছাপ সুস্পষ্ট এখানের আবহে, রাস্তাঘাট ও দোকানপাটের চেহারায়। এখানে একটি দোকান থেকে আমরা দেওয়ালে ঝোলানোর জন্যে একটুকরো কার্পেট সংগ্রহ করলাম। তিব্বতে কার্পেট তৈরীর ঘরানা হাজার বছরের। ভেড়ার লোম থেকে নেওয়া পশম প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে রাঙিয়ে তারপর তাই দিয়ে বোনা হয় কার্পেট। এই হল প্রথাগতভাবে কার্পেট বানানোর রীতি। আজকাল তিব্বতী cashmere এ ছাগল আর এন্টিলোপের পশমেরও খুব চাহিদা। লক্ষ্য করেছি এখানে সর্বত্র কাঠের বসার আসনের ওপর কার্পেট বেছানো। এটি তিব্বতী প্রথা। পর পর অনেকগুলি দোকান দেবদেবীর ধাতব মূর্তির। আমরা দু ছাড়তে দোকানে দেখলাম। একটি দোকানে একটা মূর্তি ভারী পছন্দ হয়ে গেল। কিন্তু গোল বাধল দোকানীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। মূর্তিটি কি ধাতু দিয়ে বানানো, বুদ্ধের কোন রূপ মূর্তিটিতে ফুটে উঠেছে ইত্যাদি কিছুরই জবাব দিতে পারেন না দোকানী। কারণ হল ভাষা বোঝার অসুবিধে। নানাভাবে হাত পা নেড়ে চেষ্টা করলাম আমরা। কোন ফল হল না। অগত্যা Google Translate এর শরণ নেওয়া হল। ওমা! সেও দেখা গেল কাজ করছে না। পরে বুঝেছি চীন অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে Google app টি কাজের নয়। মূর্তিটির গড়ন মন কেড়ে নিয়েছে আমাদের। উচ্চতাও মনোমত। কি করা যায়? প্রশ্ন না বাড়িয়ে কিনে ফেলব স্থির করলাম। আর এক বিপদ হল টাকা দেওয়ার সময়। সৌমেনের ফোনে Ali Pay App ডাউনলোড করে বেশ কিছুক্ষণ কসরৎ করে সে যাত্রা উদ্ধার মূর্তি কেনা হল। ইতিমধ্যে আমি বেশ অধৈর্য্য হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে দোকান থেকে প্রায় বেরিয়েই পড়ছিলাম। Thomas এর কাছ থেকে পরে জানা গেছে WeChat এর মাধ্যমেও টাকাপয়সা দেওয়া যায়। তাছাড়া মুদ্রা বিনিময় করে ATM থেকে Renminbi (তিব্বতের মুদ্রা) তো যেকোন সময়েই পাওয়া যেতে পারে।

Lhasa Kitchen এ যখন সকলে মিলে ডিনার অর্ডার দিলাম তখন মনে হচ্ছে আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। Natalie যোগ দিয়েছিল ডিনারে। Edward মাথা ধরেছে বলে হোটেলেই থেকে গেছে। আর আমাদের বাংলাদেশী ভাইয়েরা বোধহয় নিজেদের মতো ঘোরাফেরা করছে। তাই তারাও অনুপস্থিত। Lhasa Kitchen এ খাবার সুস্বাদু। চি নেপালী থালি অর্ডার দিল। আমরা আর আমাদের হাঙ্গেরিয়ান দম্পতি নিরামিষাশী। আমরা আলুর পরোটা, নিরামিষ বিরিয়ানী, এবং আরও কিছু পদ নিয়ে ভাগাভাগি করে খেলাম। বেশ আনন্দ হল। পথের আলাপ বেশ জমে উঠেছে কদিনেই। Natalie র উচ্চতার ভয়। তাই সে আর এগোতে চায় না। Elena আর Thomas এর পাহাড় চড়ার অভিজ্ঞতা অনেক। নেপালে trekking করেছে তারা। তাই ডাল আর ভাত খেতে তাদের বেশ আগ্রহ। দেখলাম বিরিয়ানির সঙ্গে রায়তা চাইলো।

রেস্তোঁরা থেকে ফেরার পথে দেখা গেল জোর বৃষ্টি নেমেছে। প্রায় রোজই পাহাড়ের মাথায় মেঘ জমা হয় শেষ বিকেলে। আর সেই মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরে সন্ধ্যেবেলা। Elena আর Thomas গাড়ী ডেকে দিল app দিয়ে। আমাদের Uber app চলছে না এখানে দেখা গেল। গাড়ী এল বেশ কিছুটা দেরীতে। আমি, সৌমেন, Natalie আর রাফা প্রায় জড়ামড়ি করে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির থেকে মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করছি। গাড়ীতে আসতে আসতে রাফা একটা ব্যক্তিগত কথা ভাগ করে নিল। তার তিব্বতে আসার কারণ হল তার দাদু। দাদু গত হয়েছেন দুবছর হল। তিনি তাঁর জীবনকালের দু বছর তিব্বতে কাটিয়েছেন তিব্বতের মানুষজন আর সংস্কৃতির প্রেমে পড়ে। কৈলাস যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু হৃদরোগের কারণে সেটা সম্ভব হয় নি। মৃত্যুকালে তিনি নাতির কাছে শেষ বাসনা প্রকাশ করেছেন, – মানসের জলে যেন তাঁর অস্থিচূর্ণ মিশে যায়। তাঁর শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে পূর্বজের অস্থিভস্ম সঙ্গে নিয়ে রাফা চলেছে মানস সরোবরের পথে। হোটেলে পৌঁছে Natalie কে বিদায় জানালাম। সে যাবে সাংহাইয়ের পথে। সে পথেই এসেছে সে। আমরাও লাসা ছাড়ব পরদিন।

তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র হল লাসা। লাসা শব্দের আক্ষরিক অর্থ "ঈশ্বরের স্থান"। পৃথিবীর অন্যান্য বড় শহরের সঙ্গে এই শহরের চরিত্রগত পার্থক্য আছে। সেই টানেই যুগে যুগে মানুষ আসছেন এখানে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে অনেককিছু। তবে ঝাঁ চকচকে রাস্তা, মল বা মোড়ে মোড়ে ক্যাফে লাসার মূলকথা নয়। বৌদ্ধমঠ, মন্দির, প্রাচীন পুঁথি, বালির মন্দালা, জপমালা, ঘোরানো সঙ্কীর্ণ গলিপথের মধ্যেই নিঃশ্বাস ফেলছে লাসার প্রাণবায়ু। সেখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে শহরের স্বরূপ। একথা বেশ বুঝতে পেরেছি। এই ভ্রমণকাহিনীর লাসাপর্ব আপাতত এখানেই শেষ। ফেরার পথে আবার একদিন লাসায় রাত্রিবাস হবে আমাদের। তবে সে গল্প তোলা রইল এখনকার মতো।

বাতায়ন

BONGO SANSKRITI

বাতায়ন

আজকাল ৭
কলকাতা শুক্রবার ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আ–মরি বাংলা ভাষা!

বাংলা ভাষা পৌঁছে যাক বিশ্বের দরবারে

বিশ্বজিৎ মতিলাল

ভাষা দিবসে বাংলা ভাষাকে নিয়ে চর্চা হয়, নতুন করে ভাবা হয়। বাংলা ভাষা উপযুক্ত মর্যাদা পাচ্ছে না, সেই নিয়েও কথা হয়। বাংলা ভাষাকে আরো কি ভাবে বেশি করে ব্যবহার করা যায় এই প্রশ্নও ওঠে। আজকে নবীন প্রজন্মের কাছে কি বাংলা ভাষা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ?

এটি সত্যি যে আজকে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে ছাত্র হচ্ছে না। ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে বেশি পয়সা দিয়ে বাবা-মা সন্তানদের ভর্তি করেছেন। তাহলে কি বাংলা ভাষা শুধু রবীন্দ্রনাথের লেখায় বা বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীতেই আটকে থাকবে ? বাংলা ভাষা কি আমাদের জীবনচর্যার অঙ্গ হবে না ? বাংলা ভাষার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বা অবস্থান আমাদের বাঙালি অস্মিতাকে উস্কে দেয় অনেকটাই, কিন্তু শুধু মাত্র কি বাংলা সাহিত্য, কবিতা, উপন্যাস, গল্পকে নিয়েই বাংলা ভাষা ? এই নিয়ে দ্বিমত আছে। আজকে পশ্চিমবাংলার বাইরে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যে এবং কিছু অন্যান্য রাজ্যেও বাংলা ভাষার প্রচলন আছে।

সুদূর অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহর থেকে "বাতায়ন" নাম দিয়ে অতি সু-সম্পাদিত ও সু-মুদ্রিত একটি বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে - একটি বাঙালি মেয়ের একক উদ্যোগে, যার নাম অনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার মেয়ে অনুশ্রী এখন পার্থে বাস করেন। শুরুতে [illegible] সহ আরো অনেক বিশিষ্ট মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

অনলাইন পত্রিকা "বাতায়ন" বছরে চারবার প্রকাশিত হয় আর জুন-জুলাই মাসে এই পত্রিকার একটি মুদ্রিত সংস্করণও প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ, রম্য-রচনা, ছোট গল্প তো থাকেই তাছাড়াও থাকে রূপকথা শিশু সাহিত্যের কথা, ভ্রমণ কাহিনী, বিজ্ঞান-সাহিত্য, সিনেমা, বই, খাওয়াদাওয়া এ সবেরও আলোচনা। প্রখ্যাত কোনো ব্যক্তির সাহিত্য আসার কথা যদি কেউ ভেবেন সেটিও মর্যাদা সহকারে প্রকাশিত হয়। তবে সব লেখা বাছা হয় গুণাগুণ বিচার করে। বিতর্কিত বিষয়ে কোনো লেখা প্রকাশিত হয়না। আলোকচিত্র ও আঁকা ছবির জায়গাও আছে। "বাতায়ন" পত্রিকা "আমাদের-আপনাদের ভালো লাগা, ভালোবাসা, আবেগ ও উচ্ছ্বাস ভাগ করে নেওয়ার একটি প্ল্যাটফর্ম", জানাচ্ছেন সম্পাদিকা।

"বাতায়ন" এর সাম্প্রতিক একটি মুদ্রিত সংখ্যা হাতে এলো "প্রভু আমার"। সংখ্যাটি রবীন্দ্র চর্চায় নিবেদিত। এই সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা, "রবীন্দ্রনাথ আজও বাংলাভাষীর বাতায়ন। সে বাতায়ন খুলে দিলে চোখে পড়ে উদার বিশ্ব। ভুলে যেতে হয় নিজেদের খণ্ডিত স্বার্থপর ভাবনা। নির্মল আলোকে জেগে ওঠে প্রাণ"।

আজ "বাতায়ন" পত্রিকা পৃথিবীর নানা প্রান্তের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধনের এক সার্থক প্রয়াস।

গোষ্ঠী সম্পাদিকা রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় বলছেন "বাতায়ন" এর মূল সুর হল সমন্বয় ও সংযোগের। আজ বাংলা ভাষা কাজে লাগুক সারা পৃথিবীর সমস্ত বাঙালির মধ্যে সমন্বয়ের ও সংযোগের কাজে।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রী যোগেন চৌধুরী, আমন্ত্রিত সম্পাদক তন্ময় চক্রবর্তী এবং "বাতায়ন" এর লেখক তালিকা যে কোনো পত্রিকার ঈর্ষা জাগানোর জন্য যথেষ্ট। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পবিত্র সরকার, সুবোধ সরকার, প্রচেত গুপ্ত, শ্রীজাত প্রমুখ অনেকেই "বাতায়ন" এর সংখ্যায় তাদের লেখা দিয়েছেন এবং এই উদ্যোগ আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে বাঙালিদের কাছে একটি উদাহরণ।

"বাতায়ন" এর সম্পাদকীয় গোষ্ঠী আরেকটি অনলাইন প্রকাশনা শুরু করেছেন "কাগজের নৌকা" নামে। যাতে মূলত উপন্যাস, বড় গল্প আর কবিতা প্রকাশিত হয়। শুরুতে নবকুমার বসুর উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি [illegible] করে পাঁচ-সাত বছর হয়ে গেলো।

ভারতবর্ষের বাইরে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষিত ও বিদগ্ধ বাঙালিরা ছড়িয়ে আছেন। যদি টোকিও বা সানফ্রান্সিসকোর বাঙালিরা নিজেদের মতো করে একটি বাংলা পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ বা অনলাইন প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন তাহলে কতই না ভালো হয় !

কলকাতার সংস্থা "বাংলা ওয়ার্ল্ডওয়াইড" একটি অনলাইন শারদীয়া সংকলন প্রকাশ করে থাকেন "মা, তোর মুখের বাণী"। কয়েক সহস্র পাঠকের ঘরে পৌঁছে যায়। পরে তার মুদ্রিত সংস্করণও প্রকাশ করা হয়। আজ প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের বাইরেও ব্যক্তি উদ্যোগে বাংলা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে যা শুধু বাংলার বাঙালিদের কাছে নয় সমগ্র পৃথিবীর বাঙালিদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

বাংলা ভাষার মর্যাদা নিয়ে শোক প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই। আমরা সবাই যদি এগিয়ে যাই তাহলে বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো আরো ভালো করে - সেটা হবে বাংলা ভাষার প্রকৃত সম্মান।

ভাষা দিবসে আমরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের জাগিয়ে তুলতে পারি এই বলে যে তারা তাদের মতো করে বাংলা ভাষার সেবা করুন। শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, বাংলা গান, বাংলা কবিতা, বাংলা ছবি এ সবকিছুতো আমার বাংলা ভাষা, তাই আজকে ভাষা দিবসে খুলে যাক বিশ্ব বাতায়ন। বাংলা শুধু বাঙালির নয়, বাংলা হোক সমগ্র বিশ্বের।

৯ পাতায় দেখুন

ভিনদেশি অনলাইন সাহিত্য আড্ডায় শ্রীজাত-তন্ময়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন: সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বাতায়ন সাহিত্য পত্রিকা আয়োজন করেছিল এই সাহিত্য সভার। সভার দুই অতিথি কবি, শ্রীজাত, তন্ময়। কলকাতায় সন্ধ্যা সাতটা। নিউইয়র্কে সাড়ে ন টা। সিডনিতে সাড়ে এগারোটা একযোগে প্রচারিত হল আড্ডা লাইভ। শিকাগো থেকে আড্ডা সঞ্চালনা করলেন রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়। মেলবোর্ন থেকে কারিগরি সহায়তা করেছেন বলার্ক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই আড্ডার আয়োজক পার্থ শহরের অনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীজাতর কাছে দর্শকদের অনুরোধ ছিল বর্ষা এবং প্রেমের কবিতা। কবি তন্ময় চক্রবর্তীর কাছে দর্শকেরা ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন তার 'আমার রবিঠাকুর' কাব্যগ্রন্থ থেকে পড়ার। দুই বন্ধু কবিতার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কখন যে দু'ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেছে, কেউ খেয়াল করেনি।

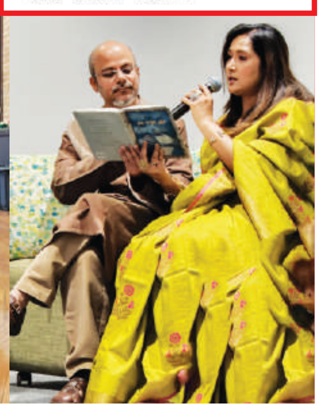

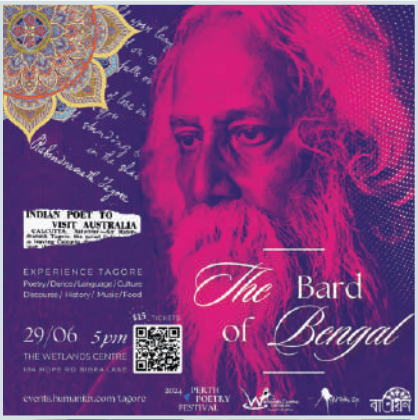
INDIAN POET TO VISIT AUSTRALIA
EXPERIENCE TAGORE
Poetry/Dance/Language/Culture
Discourse/ History/ Music/Food
29/06 5pm
THE WETLANDS CENTRE
The Bard of Bengal
events.humanitix.com/tagore

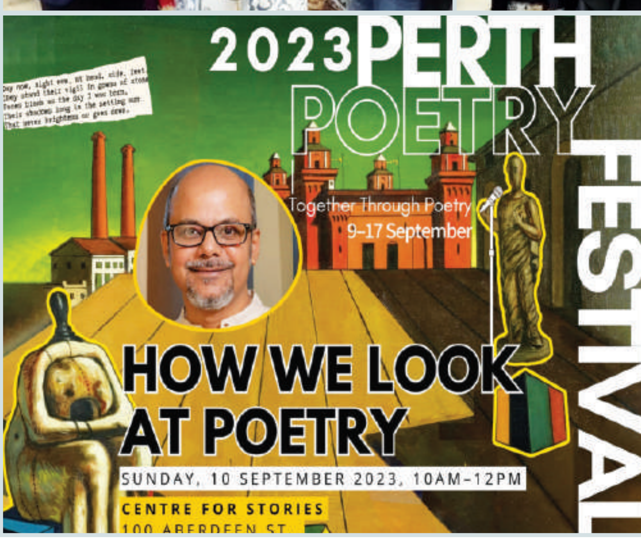
2023 PERTH POETRY FESTIVAL
Together Through Poetry
9-17 September
HOW WE LOOK AT POETRY
SUNDAY, 10 SEPTEMBER 2023, 10AM-12PM
CENTRE FOR STORIES

WA Poets Inc
PERTH POETRY FESTIVAL

বাতায়ন
চরৈবেতি
প্রাণ ভরিয়ে
ভালবেসে
নতুন ভোর
কাহিনী ও অন্যকথা
Batayan

বাতায়ন

যাত্রা শুরু: ২০১৫

একটি দশক